বাংলা

স্নাতকোত্তর (সি বি সি এস) কার্যক্রম

এম.এ. তৃতীয় সেমেস্টার

ডি এস ই/DSE - ৩০৩

বিশেষ পত্র : ভাষাতত্ত্ব

ভাষা আলোচনায় প্রাচ্য ধারা

পাঠ-সহায়ক উপাদান

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ

(ডাইরেক্টরেট অফ ওপেন এ্যান্ড ডিস্ট্যান্স লার্নিং)

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

কল্যাণী, নদীয়া-৭৪১২৩৫

পশ্চিমবঙ্গ

Post Graduate Board of Studies (PGBOS) Members of Department of Bengali, Directorate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Sl. No.	Name & Designation	Role
1	**Prof. (Dr.) Sanjit Mondal,** Professor & Head, Department of Bengali, University of Kalyani.	Chairperson
2	**Prof. (Dr.) Sabitri Nanda Chakraborty** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
3	**Prof. (Dr.) Sukhen Biswas,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
4	**Prof. (Dr.) Prabir Pramanick,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
5	**Prof. (Dr.) Nandini Bandyopadhyay,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
6	**Prof. (Dr.) Adityakumar Lala,** Professor, Department of Bengali, Gourbanga University	External Nominated Member
7	**Prof. (Dr.) Narugopal Dey,** Professor, Department of Bengali, Sidho Kanho Birsha University	External Nominated Member
8	**Dr. Rajsekhar Nandi,** Assistant Professor of Bengali, DODL, University of Kalyani.	Member
9	**Dr. Shrabanti Pan,** Assistant Professor of Bengali, DODL, University of Kalyani.	Member
10	**Prof. (Dr.) Sanjib Kumar Datta,** Director, DODL, University of Kalyani	Convener

পাঠ প্রণেতা

অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস — অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক সঞ্জিৎ মণ্ডল — অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত — সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

আগস্ট ২০২৩

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত ও ইস্ট ইন্ডিয়া ফটো কম্পোজিং সেন্টার, ২০৯এ, বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ দ্বারা মুদ্রিত।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত কোনো অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইন অনুসারে পাঠ-সহায়ক উপাদানের জন্য লেখক বা পাঠ প্রণেতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

Director's Message

Satisfying the varied needs of distance learners, overcoming the obstacle of Distance and reaching the unreached students are the three fold functions catered by Open and Distance Learning (ODL) systems. The onus lies on writers, editors, production professionals and other personnel involved in the process to overcome the challenges inherent to curriculum design and production of relevant Self Learning Materials (SLMs). At the University of Kalyani a dedicated team under the able guidance of the Hon'ble Vice-Chancellorhas invested its best efforts, professionally and in keeping with the demands of Post Graduate CBCS Programmes in Distance Mode to devise a self-sufficient curriculum for each course offered by the Directorate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Development of printed SLMs for students admitted to the DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2020 had been our endeavor. We are happy to have achieved our goal.

Utmost care and precision have been ensured in the development of the SLMs, making them useful to the learners, besides avoiding errors as far as practicable. Further suggestions from the stakeholders in this would be welcome.

During the production-process of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor **(Dr.) Amalendu Bhunia, Hon'ble Vice-Chancellor, University of Kalyani**, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it with in proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Sincere gratitude is due to the respective chairpersons as well as each and every member of PGBOS (DODL), University of Kalyani. Heartfelt thanks are also due to the Course Writers-faculty members at the DODL, subject-experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have enriched the SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I wouldespecially like to convey gratitude to all other University dignitaries and personnel involved either at the conceptual or operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their persistent and coordinated efforts have resulted in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyrights reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials are self writing and collected from e-book, journals and websites.

Professor (Dr.) Sanjib Kumar Datta
Director
Directorate of Open and Distance Learning
University of Kalyani

পাঠক্রম

বাংলা

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম

এম.এ. তৃতীয় সেমেস্টার

ডিএসই/DSE : ৩০৩

বিশেষ পত্র : ভাষাতত্ত্ব

ভাষা আলোচনায় প্রাচ্য ধারা

পর্যায় গ্রন্থ–১ :

একক–১ : পাণিনি

একক–২ : কাত্যায়ন

একক–৩ : পতঞ্জলি

একক–৪ : ভর্তৃহরি

পর্যায় গ্রন্থ–২ :

একক–৫ : হেমচন্দ্র

একক–৬ : মানোএল

একক–৭ : হ্যালহেড

একক–৮ : রামমোহন রায়

পর্যায় গ্রন্থ–৩ :

একক–৯ : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

একক–১০ : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

একক–১১ : শ্যামাচরণ সরকার

একক–১২ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পর্যায় গ্রন্থ–৪ :

একক–১৩ : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

একক–১৪ : সুকুমার সেন

একক–১৫ : আবদুল হাই

একক–১৬ : সাম্প্রতিক বাংলা ভাষাচর্চা

সূচিপত্র

তৃতীয় পত্র

ডিএসই/DSE : ৩০৩

বিশেষ পত্র : ভাষাতত্ত্ব

ডিএসই: ৩০৩	একক	পাঠ প্রণেতা	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
পর্যায় গ্রন্থ-১	১	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	পাণিনি	১-১০
	২	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	কাত্যায়ন	১১-১২
	৩	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	পতঞ্জলি	১৩-১৬
	৪	অধ্যাপক সঞ্জিৎ মণ্ডল	ভর্তৃহরি	১৭-২০
পর্যায় গ্রন্থ-২	৫	অধ্যাপক সঞ্জিৎ মণ্ডল	হেমচন্দ্র	২১-২৩
	৬	অধ্যাপক সঞ্জিৎ মণ্ডল	মানোএল	২৪-২৭
	৭	অধ্যাপক সঞ্জিৎ মণ্ডল	হ্যালহেড	২৮-৩১
	৮	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	রামমোহন রায়	৩২-৩৫
পর্যায় গ্রন্থ-৩	৯	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	৩৬-৩৯
	১০	ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৪০-৪২
	১১	ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত	শ্যামাচরণ সরকার	৪৩-৪৫
	১২	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৬-৪৯
পর্যায় গ্রন্থ-৪	১৩	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	৫০-৫৩
	১৪	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	সুকুমার সেন	৫৪-৫৬
	১৫	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	আবদুল হাই	৫৭-৬১
	১৬	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	সাম্প্রতিক বাংলা ভাষাচর্চা	৬২-৬৮

পর্যায় গ্রন্থ - ১

একক - ১

পাণিনি

বিন্যাস ক্রম :

৩০৩.১.১.১ : পাণিনি পূর্ববর্তী যুগে ভাষাচর্চা

৩০৩.১.১.২ : পাণিনির ভাষাতত্ত্বচর্চা

৩০৩.১.১.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০৩.১.১.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩০৩.১.১.১ : পাণিনি পূর্ববর্তী যুগে ভাষাচর্চা

প্রাচীন ভারতের ভাষাতত্ত্বচর্চার কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় পাণিনির কথা। খ্রি: পূ: পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত 'অষ্টাধ্যায়ী' প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ ব্যাকরণরূপে আজও বিবেচিত। সংস্কৃত ভাষাকে কেন্দ্র করে তিনি যেভাবে ভারতবর্ষে তথা সমগ্র পৃথিবীতে 'বর্ণনামূলক' ভাষাবিজ্ঞানের জন্ম দিয়েছিলেন, তার স্বীকৃতি আধুনিক যুগে পাশ্চাত্যের ভাষাবিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছেন। তাঁর আমলেই প্রাচীন ভারত ভাষাবিজ্ঞানচর্চায় উচ্চ শিখরে উঠেছিল। তবে পাণিনির আগেও প্রাচীন ভারতে ভাষাচর্চার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাচীন ভারতে ভাষাচর্চার সূচনা হয় বৈদিক যুগে। বৈদিক সংহিতাগুলির মধ্যে বিধিবদ্ধ আলোচনা না থাকলেও ভাষা সম্পর্কে বিক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্যে মধ্যে গভীর তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তবে যেহেতু ওগুলি ভাষার বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ নয়, তাই এগুলিকে ভাষার ব্যাকরণ বলা যায় না। কিন্তু ভাষাতত্ত্বচর্চায় তা উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন বেদ। কেবল ভারতের নহে, সমগ্র বিশ্বের আর্যভাষার প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ। বেদের 'সংহিতা মন্ত্রে' প্রথম ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনা পাওয়া যায়। ভাষা বিশ্লেষণের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় কৃষ্ণ যজুর্বেদে। সেখানে বলা হয়েছে বাক্ প্রথমে অপ্রত্যক্ষ ও অব্যক্ত (অখণ্ড) ছিল। ইন্দ্র প্রথম সেই অব্যাকৃত-বাক্ এর মধ্যভাগ বিশ্লিষ্ট করে তাকে ব্যাকৃত করলেন। ব্যাকৃত করা অর্থেই ব্যাকরণ (বি + আ + $\sqrt{}$ কৃ + অনট্) শব্দের প্রচলন হল। এখানে ভাষাবিশ্লেষণের উল্লেখ থাকলেও নীতিপদ্ধতি সম্পর্কে কোনো আলোচনা নেই। তবে এটা ঠিক, প্রাচীন ভারতীয় ভাষাজিজ্ঞাসা প্রধানত ব্যাকরণ রূপেই বিকাশ লাভ করেছিল। এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'ব্রাহ্মণ'। এখানে সংহিতার অনেক সূত্রের ব্যাখ্যা ও ভাষার নানা আলোচনা আছে। বর্তমানে আমরা যাকে সাংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্ব বলি; সেই ধরনের ভাষাচর্চার সূত্রপাত এই ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতেই হয়েছিল। প্রাচীন সাহিত্যের ভাষাবিশ্লেষণে যে সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তা হল—ধ্বনির উচ্চারণ, সন্ধির বিধান, পদবিভাগ, বিভক্তি, বচন ও ক্রিয়ার কাল। এইভাবে বৈদিকযুগেই 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থগুলিতে ব্যাকরণের মূল ধারণা গড়ে ওঠে। প্রাচীন ভারতে এটাই ভাষাজিজ্ঞাসার প্রথম উন্মেষ। এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্যের ভাষাবিজ্ঞানী A Berriedale Keith তাঁর 'A History of Sanskrit Literature (1973) গ্রন্থে লিখেছেন—

> "In the Brahmanas of the vedic period we find sufficient proof that, as in Greece, grammatical study in India began with consideration of such points pronunciation of parts of speech which gives us terms such a vibhakti, casetermi, present tense possibly hence it derived its name Vyakarana."

অর্থাৎ গ্রিসে যেমন ভাষাতত্ত্বচর্চা শুরু হয়েছিল, তেমনি বৈদিক যুগে 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থাবলীতে ভাষাতত্ত্বচর্চার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে ভাষাতত্ত্বচর্চার দ্বার উন্মোচিত হয়েছিল। শব্দের উচ্চারণ এবং পদবিভাগ সম্পর্কে এখানেই প্রথম ধারণা পাওয়া যায়।

বেদ পাঠের জন্য যে প্রস্তুতি দরকার, সেই প্রস্তুতি রচিত হত বেদাঙ্গের অনুশীলনে। বেদাঙ্গগুলি উত্তর বৈদিক পর্বের রচনা হলেও বেদের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল। বেদাঙ্গ ছটি। যথা—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ। এদের মধ্যে চারটিতে অর্থাৎ শিক্ষা, নিরুক্ত, ব্যাকরণ ও ছন্দে ভাষাতত্ত্বের আলোচনা আছে। 'কল্প' ও 'জ্যোতিষ' এগুলিতে ভাষাতত্ত্ব আলোচিত হয়নি। এই চারটি বেদাঙ্গই প্রাচীন ভারতের ভাষাবিজ্ঞানের উৎসস্বরূপ। এগুলি থেকেই প্রাচীন ভারতের ভাষাবিজ্ঞানের চারটি শাখা, যথা—'ধ্বনিবিজ্ঞান' (Phonetics) 'ব্যাকরণ' (Grammar) 'ব্যুৎপত্তি ও অভিধান' (stymology and lexicon) এবং 'ছন্দশাস্ত্র' (prosody) বিকশিত হয়েছে।

আধুনিক কালে যাকে আমরা ধ্বনিবিজ্ঞান বলি, বৈদিক যুগে 'শিক্ষা' বলতে তাই-ই বোঝাত। বেদাঙ্গের 'শিক্ষা' শাখায় ধ্বনির প্রকৃতি, হ্রস্বতা-দীর্ঘতা, মাত্রাভেদ, স্বরাঘাত ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা আছে। এখনকার দিনে অর্থবিস্তারের ফলে শিক্ষা বলতে সর্ববিধ বিদ্যা শিক্ষা বোঝায়। কিন্তু শিক্ষা কথাটি তখন বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হত। তখন ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব এই সব বেদেরই শিক্ষাগ্রন্থ ছিল পৃথক। যেমন—সাম বেদের শিক্ষাগ্রন্থ 'নারদীয় শিক্ষা', শুক্ল যজুর্বেদের 'যাজ্ঞবল্ক্য শিক্ষা' ও অথর্ববেদের শিক্ষাগ্রন্থ 'মাণ্ডুকী শিক্ষা'। ঋকবেদের শিক্ষা গ্রন্থ লুপ্ত হবার ফলে পাণিনির শিক্ষাকেই ঋগ্বেদের শিক্ষাগ্রন্থ বলে ধরা হয়। এতে সাধারণত ধ্বনিতত্ত্বই আলোচিত হয়েছে। কিন্তু মূল শিক্ষাগ্রন্থগুলির অধিকাংশ পরবর্তীকালে লুপ্ত হয়েছে। ফলে পরিপূরক রূপে 'প্রাতিশাখ্য'গুলির মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। যেমন—শিক্ষাগ্রন্থে সাধারণ ধ্বনিবিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা আছে। কিন্তু প্রাতিশাখ্যগুলিতে আছে প্রধানত প্রয়োগমূলক ধ্বনি (Applied phonetics) সম্পর্কে আলোচনা। আরও বলা যায় শিক্ষাগ্রন্থে বৈদিক ধ্বনির উচ্চারণ সম্পর্কে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হত এবং পরে ধ্বনিতত্ত্বের মূলনীতি আলোচনা করা হত। কিন্তু প্রাতিশাখ্য গ্রন্থগুলিতে এই মূলনীতি প্রয়োগ করে বেদের ধ্বনির বিচার করা হত। এরই সঙ্গে বেদের ধ্বনির স্বরাঘাত মাত্রা, বিষয়, সন্ধি ও শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করা হত। এছাড়াও 'প্রাতিশাখ্য' গ্রন্থগুলিতে ধ্বনিতত্ত্বের অনেক বিষয় এবং ব্যাকরণের কিছু আলোচনা পাওয়া যায়। বেদের ভাষা ক্রমে প্রাচীন হয়েছে, কিন্তু মানুষ আধুনিক হয়েছে। স্বরাঘাত চিহ্নিত করে প্রত্যেক পদ ও পদ্যাংশকে পৃথক করে দেখানো হয়েছে বেদের পদপাঠে। মোটামুটিভাবে 'শিক্ষা' গ্রন্থগুলি খ্রি: পূ: ৮ম থেকে ৫ম ও 'প্রাতিশাখ্য'গুলি খ্রি: পূ: ৫ম থেকে ১ম এর মধ্যে রচিত। বেদের সূত্রগুলির সমাস ও সন্ধি বিশিষ্টকরণ, প্রত্যয়, বিভক্তি, উপসর্গ ইত্যাদি বিশ্লিষ্ট করে প্রত্যেক পদ ও পদ্যাংশকে পৃথকীকরণ ও স্বরাঘাত চিহ্নিতকরণকেই বেদের 'পদপাঠ' বলা হয়। বেদের পদপাঠের এই বিশ্লেষণ থেকেই বোঝা যায় ভাষাতত্ত্বচর্চায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ছিল। সে কারণেই সমাস, সন্ধি, ধ্বনির স্বরূপ ও স্বরাঘাত সেখানে আলোচিত হয়েছে।

আসলে 'ব্রাহ্মণ' ও বেদাঙ্গের 'শিক্ষা'য় ধ্বনিবিজ্ঞানের যে বিকাশ হয়েছিল তারই সার্থক পরিচয় বহন করে বেদের পদপাঠগুলি। যথার্থই বলেছেন winterneit তাঁর 'A History of Indian, Literature' (vol-1-1972) গ্রন্থে—

"Pada-paths ..... are the oldest
production of the Siksa schools."

অর্থাৎ পদপাঠগুলি শিক্ষাগ্রন্থেরই অঙ্গ।

প্রাচীন ভারতের ভাষাতত্ত্বের আর একটি সমৃদ্ধ ধারা হল 'নিরুক্ত' ও 'কোশগ্রন্থ'। ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের প্রথম প্রয়াস দেখা গিয়েছিল ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে! কিন্তু সেই সব ব্যুৎপত্তি বৈজ্ঞানিক ও বিধিবদ্ধ ছিল না। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিধিবদ্ধভাবে ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের সার্থক নিদর্শন পাওয়া যায় যাস্কের 'নিরুক্ত'-এর মধ্যে। আর বৈদিক ভাষায় অপ্রচলিত দুর্বোধ্য শব্দগুলির একটি তালিকা 'নিঘন্টু' নামে সমসাময়িক কালেই প্রকাশিত হয়। স্বামী দয়ানন্দ ও পণ্ডিত ভগবৎ দত্ত দুজনেরই মতে যাস্ক (খ্রি: পূ: ৮ম) নিঘন্টুর রচয়িতা। আবার 'মহাভারত' থেকে জানা যায় প্রজাপতি কাশ্যপ ছিলেন এর রচয়িতা।

'নিরুক্ত' গ্রন্থটিতে আছে মোট পাঁচটি অধ্যায়। যথা—

প্রথম তিন অধ্যায়—নৈঘুন্টক কাণ্ড। এখানে বৈদিক শব্দের প্রতিশব্দ নিয়ে আলোচনা আছে।

চতুর্থ অধ্যায়—নৈগম কাণ্ড। এখানে দুরূহ শব্দাবলী তালিকা দেওয়া হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়—দৈবত কাণ্ড। এখানে বৈদিক দেবদেবীর তালিকা দেওয়া হয়েছে।

যাস্ক বৈয়াকরণ ছিলেন না। কিন্তু ব্যাকরণের মূল কাঠামোর বোধ তাঁর ছিল। তাই 'নিরুক্ত' গ্রন্থে শব্দের ব্যুৎপত্তিই শুধু দেওয়া হয়নি, তাদের অর্থও আলোচিত হয়েছে। এখানে 'পদবিভাগ' (part of speech) নিয়ে আলোচনা আছে। অর্থাৎ বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা আছে। আবার শব্দবিভক্তি ও ক্রিয়াবিভক্তি সম্পর্কে আলোচনা এখানে আছে। যাস্ক 'নিরুক্ত' গ্রন্থের মধ্যে তৎকালে যে অর্থগত বিষয়টি উদ্ভাবন করেছিলেন, সেটাই পরবর্তীকালে অনুসৃত হয়েছে এবং ভারতবর্ষে অভিধান রচিত হয়েছে।

যাস্কের আগে শাকটায়ন শব্দের মূলতত্ত্বের কথা বলেন। তিনি সমস্ত ক্রিয়া, এমনকী নাম শব্দ এবং তা কোন্ ধাতু থেকে জাত, এই মতবাদের সূচনা করেছিলেন। যাস্ক এই ধারণাকে সামনে রেখেই 'নিরুক্ত' গ্রন্থটি লেখেন। অর্থাৎ শাকটায়ন শব্দের মূল তত্ত্বের কথা প্রথম বললেও তাকে প্রতিষ্ঠা দেন যাস্ক। বিশেষজ্ঞদের মতে ভারতীয় ভাষাবিজ্ঞানের ইতিহাসে এটাই যাস্কের আসল অবদান। আধুনিক গবেষকরা মনে করেন পাণিনি তাঁর 'অষ্টাধ্যয়ী' গ্রন্থটি লেখেন যাস্কের 'নিরুক্ত' গ্রন্থটিকে সামনে রেখেই।

কাত্যায়ন তাঁর 'নামশালা' এবং অমরসিংহ 'নামলিঙ্গানুশাসন' রচনা করেন যাস্কের 'নিরুক্ত' গ্রন্থটিকে সামনে রেখেই।

বৈদিক সংহিতার প্রধান অংশই ছন্দোবদ্ধ পদ্যে রচিত। তাই বেদ অধ্যয়নের প্রস্তুতি হিসেবে ছন্দোশাস্ত্র পঠিত হত। আর এই ছন্দোবিজ্ঞান বেদাঙ্গের অন্যতম শাখা ছিল। 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থাবলী ও ঋগ্বেদের প্রাতিশাখ্যে ছন্দ সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল। কিন্তু ছন্দ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা তাতে ছিল না। ছন্দ সম্পর্কে প্রথম পূর্ণাঙ্গ আলোচনা গ্রন্থ হল পিঙ্গলের 'ছন্দঃসূত্র'। এখানে বেদের সাতটি প্রধান ছন্দ যথা—গায়ত্রী, উষ্ণিক, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পুংক্তি, ত্রিষ্টুপ ও জগতী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখান থেকে ছন্দ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যায়।

ভাষাতত্ত্বচর্চায় 'ব্যাকরণ' গ্রন্থের ভূমিকাও কম নয়। এখানে পদবিভাগ, সন্ধির বিধান ইত্যাদি আলোচনা হয়েছে। এই সময় ব্যাকরণ বলতে মানুষ Morphology-কেই বুঝত। কারণ ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ে স্বতন্ত্র শাখা গড়ে উঠেছিল। যার নাম 'শিক্ষা' ও 'প্রাতিশাখ্য'।

বস্তুত প্রাক্ পাণিনিযুগে উল্লেখযোগ্য ব্যাকরণ গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায় না। পাণিনি তাঁর পূর্ববর্তী অনেক বৈয়াকরণকে উল্লেখ করেছেন। যেমন—শাকটায়ন, কাশ্যপ, ভরদ্বাজ, গালব প্রমুখ। কিন্তু পূর্বসুরীদের ব্যাকরণ গ্রন্থের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি। শুধু যাস্কের 'নিরুক্ত' গ্রন্থটি পাওয়া গেছে। কিন্তু তাঁর রচনাটি ব্যাকরণের ধারায় পড়ে না। তাই খ্রি: পূ: ৫০০ অব্দে পাণিনি রচিত 'অষ্টাধ্যায়ী' গ্রন্থটিই ভারতবর্ষের প্রথম ব্যাকরণ, আর পাণিনির আগে ভাষাতত্ত্বচর্চার ক্ষেত্রে বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষদ, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি গ্রন্থের নাম করা যেতে পারে।

৩০৩.১.১.২ : পাণিনির ভাষাতত্ত্বচর্চা

প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাষাবিজ্ঞানী। তিনি 'অষ্টাধ্যয়ী' ব্যাকরণ রচনা করেন। রচনার মধ্যে তাঁর ব্যক্তিজীবনের কোনো তথ্যই পাওয়া যায় না। পতঞ্জলি তাঁকে বলেছেন 'দাক্ষীপুত্র'। অনেকে এই নাম থেকে অনুমান করেন তাঁর মায়ের নাম ছিল দাক্ষী। তবে পাণিনির পিতার নাম জানা যায়নি। পাণিনির জন্ম পরিচয়ই নিয়েই শুধু নয়, তাঁর আবির্ভাব কাল নিয়েও নানা বিতর্ক আছে। বিখ্যাত ভারতীয় পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রয়ীর মতে পাণিনির আবির্ভাব কাল ২৪০০ খ্রি: পূ:। কিন্তু ভেবর ও মাক্সমূ্যলরের মতে খ্রিস্টের জন্মের ৩৫০ বছর আগে পাণিনির আবির্ভাব হয়। আর গোল্ডস্ট্যুকার পাণিনির জন্মকাল নিয়ে নানা গবেষণা করে সিদ্ধান্তে আসেন পাণিনির আবির্ভাবকাল খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী। আবার ভাণ্ডারকর বলেছেন পাণিনি ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের আগেই আবির্ভূত হন। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত করেছেন যে পাণিনি খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে তাঁর 'অষ্টাধ্যয়ী' ব্যাকরণ রচনা করেন। তাহলে মোটামুটি ভাবে বলা যায় পাণিনি খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

পাণিনি ছিলেন উত্তর-পশ্চিম ভারতের অধিবাসী। তিনি যখন ব্যাকরণ রচনা করেন, তখন বৈদিক ভাষা, শাস্ত্রের গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। উদীচ্য ও মধ্যদেশের (বর্তমান দিল্লি থেকে মথুরা) মানুষের মুখের ভাষাকে গ্রহণ করেই তো পাণিনি 'অষ্টাধ্যয়ী' ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন। তাঁর মতে লৌকিকভাবে ব্যবহৃত বৈদিক ভাষাই পরিবর্তিত হয়ে সংস্কৃত হয়েছে।

পাণিনির 'অষ্টাধ্যয়ী' ব্যাকরণ আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেকটি অধ্যায়ে চারটি পদ আছে। এই ব্যাকরণের প্রথম অধ্যায়ে আছে অনেকগুলি সংজ্ঞার ব্যাখ্যা ও পরিভাষায় পরবর্তী অধ্যায়সমূহের সূত্রগুলি ব্যাখ্যার নিয়মের আলোচনা। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সমাস, কারক ও বিভক্তি নিয়ে আলোচনা আছে। তৃতীয় অধ্যায়ে কৃৎ প্রত্যয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে তদ্ধিত প্রত্যয়, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে স্বরাঘাত ও ধ্বনি পরিবর্তনের নিয়ম নীতির আলোচনা আছে এবং অষ্টম বা শেষ অধ্যায়ে স্বরাঘাতবিধি ও সন্ধির নিয়ম আলোচিত হয়েছে।

তবে পাণিনির ব্যাকরণের বিষয় বিভাগ আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের মতো নয়। অনেক সময় একটি বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো বিষয়ের আলোচনাও শেষ করেছেন। তাঁর বিন্যাসরীতি অপূর্ব। যেমন আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে রূপতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় হল কৃৎ প্রত্যয়। কিন্তু কৃৎ প্রত্যয় আলোচনার সাথে সাথে তৃতীয় অধ্যায়ে পাণিনি স্বরাঘাতের আলোচনাও করেছেন। কিন্তু এই স্বরাঘাত রূপতত্ত্বের নয়, ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু পাণিনি রূপতত্ত্বের সাথে ধ্বনিতত্ত্বের কিছু আলোচনাও সেরে নিয়েছেন। আবার সন্ধি রূপতত্ত্বের বিষয় না হলেও তিনি রূপতত্ত্বের বিভিন্ন প্রসঙ্গের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। অনেকে এটিকে ত্রুটিপূর্ণ মনে করেছেন। কিন্তু পাণিনির মতে বিষয় বিন্যাসের নিজস্ব রীতি এটি। আসলে রূপতত্ত্বের সঙ্গে ধ্বনিতত্ত্ব যেখানে যুক্ত সেখানে রূপতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্বের পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন। আধুনিককালের ভাষাবিজ্ঞানীরা রূপতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্বের পার্থক্য সবসময় মেনে চলেননি।

তাঁর ব্যাকরণে চার হাজার সূত্র আছে মোট আটটি অধ্যায়ে। এর মধ্যে আড়াই হাজার সূত্র পাণিনির নিজের। আর বাকি দেড় হাজার কাত্যায়নের 'বার্তিক সূত্র'। এই সূত্রগুলিকে সাতটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা—(১) সংজ্ঞা (defination) (২) পরিভাষা (interpretation) (৩) বিধি (general rule) (৪) নিয়ম (particular rule) (৫) অপবাদ (exception) (৬) অধিকার (governing rule) (৭) অতিদেশ (extertion rule)। সূত্রগুলির নির্মাণ কৌশলে ও বিন্যাসে ব্যাকরণটি সংক্ষিপ্ত ও সংহত হয়েছে। তবে সংস্কৃত ভাষা বোঝার মতো নির্মাণ কৌশল এখানে নেই। যারা সংস্কৃত ভাষা জানে, তারাই এই ব্যাকরণ পাঠে যথার্থভাবে সমর্থ হবে।

অষ্টাধ্যয়ীতে যে সব সূত্র আছে তার মধ্যে কতকগুলি প্রধান সূত্র (Main laws) এবং কতগুলি উপসূত্র (Sub laws) আছে। অধিকার সূত্রগুলি, উপসূত্রগুলিকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে। তবে প্রত্যেকটি

উপসূত্রের সঙ্গে প্রধান সূত্রগুলি পাঠ্য হিসেবে যুক্ত। অধিকার সূত্রের অংশ বারবার উপসূত্রের সঙ্গে ধরে নিতে হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলে অনুবর্তন বা অনুবৃত্তি। কিন্তু পাণিনি প্রত্যেক উপসূত্রের সঙ্গে প্রধান সূত্রগুলির পুনরাবৃত্তি করেননি। আবার অনেক সময় অনুবৃত্তি উহ্য রেখেছেন। যেমন—'সুপ্তিঙন্তংপদম' এই অধিকার সূত্রটির শেষে আছে 'পদম'। কিন্তু উপসূত্রে বলা হয়েছে 'নঃ ক্যে'। এখানে উহ্য রয়েছে 'পদম'। অর্থাৎ উপসূত্র সংক্ষিপ্ত হয়েছে।

পাণিনির ব্যাকরণে সংক্ষিপ্ততা সাধনের জন্য একটা কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। সেটা হল ব্যবহৃত সূত্রগুলির মধ্যে অনেকক্ষেত্রে পুরো বাক্য ব্যবহার না করে শুধু কতগুলি বর্ণের সাহায্যে সংক্ষেপে বীজগণিতের সূত্রের মতো প্রতীকধর্মী সূত্র রচিত হয়েছে। গ্রন্থের প্রথমে উদ্ধৃত ১৪টি প্রত্যাহার সূত্র বা মহেশ্বর সূত্রগুলিই বীজগণিতের সূত্রের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। যেমন—

(১) অইউন্ (২) ঋ৯ন্ক্ (৩) এ ও ঙ (৪) ঐ ঔ চ্ (৫) হয় ব রট্ (৬) লন্ (৭) ঞমঙণনম্ (৮) ঘটধ্ষ (৯) ঝঙঞ (১০) জবগতদশ্ (১১) খ ফ ছ ঠ থ চ ট ত ব্ (১২) ক প য্ (১৩) শ ষ স র্ (১৪) হল্।

এই সূত্রগুলিই পাণিনির ব্যাকরণের মূল চাবিকাঠি। কিন্তু এই সূত্রগুলি সংক্ষিপ্ত। ফলে সংক্ষিপ্ততার জন্য শিক্ষার্থীর কাছে এগুলি অর্থহীন ধ্বনিসমষ্টি (non-sense sound) বলে প্রতিভাত হয়। কিন্তু এগুলি অবশ্য প্রয়োজনীয়, বিশেষ করে সংস্কৃত ধ্বনির প্রসঙ্গকে সংক্ষেপে উল্লেখ করার জন্য সূত্রগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অনুস্বার, বিসর্গ, জিহ্বামূলীয় এবং উপধ্বনীয়কে বাদ দিলে প্রত্যাহার সূত্রগুলির মধ্যে সংস্কৃত ভাষার সমগ্র বর্ণমালা বর্তমান। যেমন—সন্ধির একটি সূত্রে পাণিনি বলেছেন—

"অকঃ সবর্ণে দীর্ঘ"।

আগে আমরা দেখলাম অ-ই-উ-ঋ-৯—এই বর্ণগুলিকে সংক্ষেপে অক্ বলা হয়। সুতরাং সন্ধির ওই সূত্রটির অর্থ হল অ, ই, উ, ঋ, ৯ এদের সমান স্বরের পর সমান স্বর থাকলে দীর্ঘস্বর হয়। অর্থাৎ 'অ', এর পর 'অ' থাকলে দুটো মিলে দীর্ঘস্বর হয়। আবার 'ই' এর পর 'ই' থাকলে তা মিলে হবে 'ঈ'। এই প্রত্যাহার সূত্রগুলিও ছাড়া পাণিনি অনেক সূত্র বীজগাণিতিক নিয়মে রচনা করেছেন।

পাণিনির ব্যাকরণ চিন্তায় আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গণবিভাগ। মূল বিষয়টুকু তিনি 'অষ্টাধ্যায়ী' অধ্যায়ে উল্লেখ করে 'গণপাঠ' গ্রন্থে তার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যে সব ধাতু একই রকম নিয়ম অনুসরণ করেও একই রকম ক্রিয়ারূপ লাভ করে সেগুলিকে তিনি একটি গণে বিন্যস্ত করেছেন। সংস্কৃতের সব ধাতুকে ১০টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন—যে সব ধাতুর রূপ 'ভূ' ধাতুর মতো তাদের ভ্বাদিগণীয় বলা হয়েছে। 'তুদ্' ধাতুর মতো হলে 'তুদাদিগণীয়' বলা হয়েছে।

পাণিনি বাক্যকে ভাষার প্রথম বৃহত্তম একক রূপে (Unit) গ্রহণ করে বিশ্লেষণ করেছেন। এবং বাক্যকে ক্রমশ ক্ষুদ্রতর এককের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তিনি বাক্যের বিভিন্ন অংশকে 'পদ' বলেছেন। পদের মধ্যে বিভিন্ন অংশ জুড়ে আছে ক্রিয়া। এই ক্রিয়ার মূল অংশ হল ধাতু। তবে পাণিনি ক্রিয়া ছাড়া নামশব্দের বিশ্লেষণে ও তার মূলেও ধাতুই পেয়েছেন। পাণিনির মতে সব শব্দই এমনকী নামশব্দ ধাতু থেকেই নিষ্পন্ন। পাণিনির এই তত্ত্বকে ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা "root theory" বলেছেন। এই তত্ত্বটি প্রথম প্রবর্তন করেন শাকটায়ন।

পাণিনি পৃথিবীর প্রথম এককালিক বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানী। কারণ তিনি সংস্কৃত ভাষার এককালের রূপ বিশ্লেষণ করলেও ওই ভাষার বিভিন্ন কালের বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করেননি। তিনি শুধু ভাষায় গঠনের ওপর ভিত্তি করে পদের সংজ্ঞা দিয়েছেন। আবার পদ কি নিয়ে গঠিত, তা উল্লেখ করেছেন। তবে পদের অর্থ বা ভাবের প্রসঙ্গ তিনি আনেননি। এজন্য তাঁকে গঠন সর্বস্বতাবাদী ভাষাবিজ্ঞানী বলা হয়। তবে অনেকক্ষেত্রে পদের অর্থের সাহায্য নিয়েও সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—'পূর্বপদার্থপ্রধানোহব্যয়ীভাব, অর্থাৎ পূর্বপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতিয়মান হয় যে সমাসে তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলা হয়। আবার তৎপুরুষ' সমাসের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে—'উত্তরপদার্থপ্রধানস্তৎপুরুষ'। অর্থাৎ সংজ্ঞাতে বোঝা যাচ্ছে উত্তরপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হলে তৎপুরুষ সমাস হবে। এখানে অর্থের সাহায্য নিয়ে সংজ্ঞা রচনা করা হয়েছে। তবে গঠনসর্বস্বতাবাদীদের মতো পাণিনি নন। কারণ তিনি ভাষার অর্থের ওপর যেমন গুরুত্ব দিয়েছেন তেমনি গঠনের ওপরেও। তবে পাণিনিকে গঠনসর্বস্বতাবাদী নিঃসন্দেহে বলা না গেলেও নিশ্চিতভাবে বলা যায়, তিনি বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানী।

শুধু প্রাচীন ভারতের নয়—পাণিনি সারা পৃথিবীর প্রথম বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানী। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানীরা (যেমন ড. সত্যস্বরূপ মিশ্র) স্বীকার করেছেন বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে ও সংস্কৃতে তাঁর অবদানকে—

"the first descriptive grammar of language,
being the sanskrit grammar of Panini ....."

এছাড়া পাশ্চাত্যের ভাষাবিজ্ঞানীরা পাণিনিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছেন যে পাণিনির ব্যাকরণ মানব মনীষার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তিস্তম্ভ।

আর অতি আধুনিক কালের ভাষাবিজ্ঞানীরা পাণিনির ব্যাকরণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে স্বীকার করে এই ব্যাকরণকে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় রচিত প্রথম বৈজ্ঞানিক রচনা বলে উল্লেখ করেছেন। পাশ্চাত্য দেশে পাণিনির ব্যাকরণের একটা সংস্করণ বের করেন ওটো ব্যোয়েটলিঙ্ক। এই সংস্করণ পাশ্চাত্য দেশের বর্ণনামূলক

ভাষাবিজ্ঞানীদের ওপরই পাণিনির প্রভাব পড়েনি, আধুনিক রূপান্তরমূলক সৃজনমূলক ভাষাবিজ্ঞানী চমস্কি ও (chomsky) পাণিনির ব্যাকরণে তাঁর নিজের অভিনব তত্ত্বের বীজ আবিষ্কার করেছিলেন—

> "What is more, it seems that even panini's grammar can be that even as a fragment of such a generative grammar in essentially the contemporary sense of this term."

পাণিনিকে শুধু শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্য চমস্কি উপরোক্ত মন্তব্য করেননি। এর মধ্যে একটা তথ্যনির্ভর সত্যতা আছে। এই সত্য পরবর্তীকালের গবেষকরা আবিষ্কার করেছেন। পাণিনির ব্যাকরণে চমস্কির 'Deep Structure' ও 'Surface Structure'-এর তত্ত্ব দেখেছেন অনেকেই। সুতরাং সব মিলিয়ে বলা যায় সারা বিশ্বের ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে মহামনীষী পাণিনি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

৩০৩.১.১.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। প্রাক্-পাণিনি যুগের ভাষাতত্ত্বচর্চা কীভাবে হয়েছিল, তা বুঝিয়ে দাও।

২। পাণিনি কে ছিলেন? বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বচর্চায় তাঁর অবদান লেখো।

৩। পাণিনির ভাষাতত্ত্বচর্চাই হল প্রাচীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ চর্চা, আলোচনা করো।

৩০৩.১.১.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা (১৪০৩)—ড. রামেশ্বর শ, পুস্তক বিপণি।

২। 'ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৯৬)—সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

৩। 'আধুনিক ভাষাতত্ত্ব' (১৯৯৭)—আবুল কালাম মনজুর, মোরশেদ, নয়া উদ্যোগ।

৪। 'ভাষাতত্ত্ব' (১৩৯৬)—রফিকুল ইসলাম, উজ্জ্বল বুক স্টোরস্।

৫। 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৯৮)—মহম্মদ শহীদুল্লাহ, মাওলা ব্রাদার্স।

৬। 'ভাষাবিদ্যা পরিচয়' (২০০২)—অধ্যাপক পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, জয়দুর্গা লাইব্রেরি।

৭। 'ভাষা পরিক্রমা' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ২০০২)—অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মজুমদার, দেজ পাবলিশিং।

৮। 'ভাষা দেশ-কাল' (২০০০)—পবিত্র সরকার, মিত্র ও ঘোষ।

৯। 'ভাষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধাবলী' (১৯৯৮)—রফিকুল ইসলাম, বাংলা একাডেমি।

১০। 'ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা' (২০০৪)—অনিমেষকান্তি পাল, বামা পুস্তকালয়।

১১। 'বাঙালির ভাষচিন্তা' (২০০২)—সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

১২। 'বাঙালির ভাষাচিন্তা' (সমাজভাষা, ২০০৩)—সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

১৩। 'বাংলা গদ্য স্টাইলিস্টিকস্' (২০০১)—নবেন্দু সেন, মহাদিগন্ত।

১৪। 'ফলিত ভাষাবিজ্ঞান' (১৯৯৭)—ভূদেব বিশ্বাস ও ভবদেব বিশ্বাস, তাহেরপুর কবিতা কুটির।

১৫। 'শৈলীবিজ্ঞান' (১৯৯৮)—অপূর্ব দে, মডার্ন বুক এজেন্সি।

১৬। 'সাহিত্যালোচনা ও শৈলীবিজ্ঞান' (১৯৯৪)—আশিস দে, পুস্তক বিপণি।

একক - ২

কাত্যায়ন

বিন্যাস ক্রম :

৩০৩.১.২.১ : পাণিনি পূর্ববর্তী যুগের ভাষাতত্ত্বচর্চা

৩০৩.১.২.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০৩.১.২.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩০৩.১.২.১ : পাণিনি পরবর্তী যুগের ভাষাতত্ত্বচর্চা

পাণিনির পর ভারতবর্ষে ব্যাকরণচর্চার ধারায় অনুর্বরতার পর্ব চলে। তারপরে ভারতীয় ব্যাকরণচর্চায় কয়েকজনের নাম পাওয়া যায়, যাঁরা পাণিনির ব্যাকরণ ধারার সঙ্গে যুক্ত। এঁরা হলেন কাত্যায়ন, পতঞ্জলি, ভর্তৃহরি প্রমুখ। এঁরা পাণিনির ব্যাকরণকে সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে পূর্ণতা আনেন। প্রথমেই আসবে কাত্যায়নের নাম।

কাত্যায়নের আবির্ভাবকাল নিয়ে বিতর্ক আছে। বেলভালকরের মতে তাঁর আবির্ভাবকাল খ্রিঃ পূঃ পঞ্চম-চতুর্থ শতাব্দী, কীথের মতো খ্রিঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী। আর কথাসিরৎসাগরে বলা হয়েছে তিনি পাণিনির সহপাঠী। তবে আধুনিক গবেষকরা মনে করেন তিনি পাণিনির অনেক পরবর্তীকালের ব্যাকরণবিদ।

কাত্যায়ন ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক দুটি গ্রন্থ লেখেন—(১) 'বার্তিক' (২) 'বাজেসনেয়ি প্রাতিশাখ্য। ভাষাতত্ত্বচর্চায় এই দুটি গ্রন্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে 'বার্তিক' গ্রন্থটি। কারণ এই গ্রন্থে তিনি পাণিনির সূত্রকে যেমন খণ্ডন করেছেন, তেমনি নিজেও কিছু সূত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পাণিনির ব্যাকরণের সূত্রগুলি পরবর্তীকালে অচল হয়ে যায়। তিনি এই অচল সূত্রগুলোকে বাদ দেন। পাণিনির সব সূত্রের সমালোচনা না করে মাত্র দেড় হাজার সূত্র কাত্যায়ন সংশোধন করেছেন। এরই পাশাপাশি কিছু নতুন সূত্রও তিনি লিখেছিলেন। 'বার্তিক'-এর সূত্রগুলি কোথাও পদ্যে রচিত। অর্থাৎ ভাষার দুটি রীতিতেই তিনি ব্যাকরণ রচনা করেন। কাত্যায়নের 'বার্তিকসূত্র' রচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল পাণিনির 'অষ্টাধ্যয়ী' ব্যাকরণের সংশোধন ও পরিমার্জনের সঙ্গে সঙ্গে কিছু বিরুদ্ধ সমালোচনা করা। তাই অনেকে তাঁকে পাণিনি সম্প্রদায়ের বহির্ভূত বলে মনে করেন। কথাসরিৎসাগরের উল্লেখ থেকে জানা যায় তিনি

ঐন্দ্র সম্প্রদায়ের বৈয়াকরণ ছিলেন। পতঞ্জলির উল্লেখ থেকে জানা যায় কাত্যায়ন দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী ছিলেন। কেননা দক্ষিণ ভারতে পাণিনির ব্যাকরণের থেকে পৃথক একটি ব্যাকরণের প্রভাব ছিল। তিনি সেই ব্যাকরণের আদর্শ অনুসরণ করেন। সে কারণেই ভাসের নাটকেও এমন কিছু প্রয়োগ চোখে পড়ে যা পাণিনির থেকে আলাদা।

৩০৩.১.২.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। পাণিনি পরবর্তীযুগে কাত্যায়ন, পতঞ্জলি প্রমুখের হাতে ভাষাতত্ত্বচর্চার বিকাশ কীভাবে হয়েছিল, তা আলোচনা করো।

২। ভাষাতত্ত্বচর্চায় কাত্যায়ন, পতঞ্জলি ও ভর্তৃহরির অবদান লেখো।

৩০৩.১.২.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা (১৪০৩)—ড. রামেশ্বর শ, পুস্তক বিপণি।

২। 'ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৯৬)—সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

৩। 'আধুনিক ভাষাতত্ত্ব' (১৯৯৭)—আবুল কালাম মনজুর, মোরশেদ, নয়া উদ্যোগ।

৪। 'ভাষাতত্ত্ব' (১৩৯৬)—রফিকুল ইসলাম, উজ্জ্বল বুক স্টোরস্।

৫। 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৯৮)—মহম্মদ শহীদুল্লাহ্, মাওলা ব্রাদার্স।

৬। 'ভাষাবিদ্যা পরিচয়' (২০০২)—অধ্যাপক পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, জয়দুর্গা লাইব্রেরি।

৭। 'ভাষা পরিক্রমা' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ২০০২)—অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মজুমদার, দেজ পাবলিশিং।

৮। 'ভাষা দেশ-কাল' (২০০০)—পবিত্র সরকার, মিত্র ও ঘোষ।

৯। 'ভাষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধাবলী' (১৯৯৮)—রফিকুল ইসলাম, বাংলা একাডেমি।

১০। 'ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা' (২০০৪)—অনিমেষকান্তি পাল, বামা পুস্তকালয়।

১১। 'বাঙালির ভাষাচিন্তা' (২০০২)—সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

১২। 'বাঙালির ভাষাচিন্তা' (সমাজভাষা, ২০০৩)—সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

১৩। 'বাংলা গদ্য স্টাইলিস্টিকস্' (২০০১)—নবেন্দু সেন, মহাদিগন্ত।

১৪। 'ফলিত ভাষাবিজ্ঞান' (১৯৯৭)—ভূদেব বিশ্বাস ও ভবদেব বিশ্বাস, তাহেরপুর কবিতা কুটির।

১৫। 'শৈলীবিজ্ঞান' (১৯৯৮)—অপূর্ব দে, মডার্ন বুক এজেন্সি।

১৬। 'সাহিত্যালোচনা ও শৈলীবিজ্ঞান' (১৯৯৪)—আশিস দে, পুস্তক বিপণি।

একক - ৩

পতঞ্জলি

বিন্যাস ক্রম :

৩০৩.১.৩.১ : পতঞ্জলি

৩০৩.১.৩.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০৩.১.৩.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩০৩.১.৩.১ : পতঞ্জলি

কাত্যায়নের 'বাজসনেয়ি প্রাতিশাখ্য'-তে শুক্ল যজুর্বেদের ভাষার ধ্বনি, বানান ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা আছে। গ্রন্থটি মূলত বেদকেন্দ্রিক ছিল। এটি তুলনামূলক ভাবে অন্য ধরনের গ্রন্থ। 'বার্তিক' গ্রন্থের তুলনায় এই গ্রন্থে কাত্যায়নের বেশি মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। একথা অবশ্যই বলতে হয় যে কাত্যায়ন তাঁর 'বার্তিক' সূত্রে পাণিনির ব্যাকরণের বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছেন ঠিকই, কিন্তু কাত্যায়নের সমালোচনার জন্যই পাণিনির ব্যাকরণ আরও বেশি পরিণত ও গ্রহণীয় হয়ে উঠেছিল। তাই প্রাচীন ভারতের বৈয়াকরণদের মধ্যে কাত্যায়ন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাণিনির ব্যাকরণকে আরও গ্রহণীয় করে তুলেছে কাত্যায়নের এই ব্যাকরণ। কাত্যায়নের সঙ্গে পতঞ্জলির কালগত ব্যবধান অনেক। তিনি খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সুতরাং কাত্যায়নের প্রায় দুশো বছর পর পতঞ্জলি আবির্ভূত হন। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে পতঞ্জলি তার ব্যাকরণ গ্রন্থ 'মহাভাষ্য' রচনা করেন। পাণিনির মতই এই গ্রন্থটি আটটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। প্রত্যেকটি অধ্যায়ে চারটি করে পর্ব আছে। পতঞ্জলির ব্যাকরণ ছিল মূলত টীকামূলক। কাত্যায়ন তাঁর 'বার্তিক' গ্রন্থে পাণিনির বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। কিন্তু পতঞ্জলি 'মহাভাষ্য' গ্রন্থে পাণিনির সূত্রকেই পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেছেন। পাণিনি যেভাবে ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন সেই ধারাকে সামনে রেখেই পতঞ্জলি দ্বিতীয় শতকে তাঁর ব্যাকরণ গ্রন্থ 'মহাভাষ্য' রচনা করেন।

বিশ্লেষণমূলক ব্যাকরণের নীরস বস্তুকে যাঁরা সরস করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন পতঞ্জলি। স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং পাণিনির অনুরাগী পাঠক ছিলেন। তিনি পাণিনির ব্যাকরণের এই ভাষ্যগ্রন্থটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে 'ভাববার কথা' গ্রন্থে বলেছিলেন—

> "পতঞ্জলির মহাভাষ্য দেখ, শেষ আচার্য শঙ্করের ভাষ্য দেখ, আর অর্বাচীন কালের সংস্কৃত দেখ, এখুনি বুঝতে পারবে যে, যখন মানুষ বেঁচে থাকে তখন জেন্ত কথা কয়, মরে গেলে মরা ভাষা কথা কয়।"

বিবেকানন্দ পাণিনির অনুরাগী পাঠক ছিলেন কিন্তু তিনি পতঞ্জলির রচনারীতির যে সব বিক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করেছেন তা বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সমর্থিত হতে পারে।

কাত্যায়ন, পতঞ্জলির পরে প্রাচীন ভারতে ব্যাকরণ রচনায় আবার অনুর্বরতা দেখা যায়।

এই সময়ে ব্যাকরণ রচনার ধারায় আবির্ভূত হন চন্দ্রগোমী, ৪৭০ খ্রিস্টাব্দে তিনি ব্যাকরণ রচনা করেন, কিন্তু চন্দ্রগোমী রচিত ব্যাকরণটি ছিল পাণিনির 'অষ্টাধ্যয়ী' ব্যাকরণের ভাষ্য। তাঁর ব্যাকরণে কোনো মৌলিক চিন্তার বিকাশ দেখা যায় না। চন্দ্রগোমী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি ভারতীয় উপনিষদের হিন্দুত্বের কথা সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গীতে তাঁর ব্যাকরণ গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। চন্দ্রগোমী হিন্দুধর্মীয় ভাবনা থেকে সরে এসে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ব্যাকরণ রচনা করেন। কিন্তু তাঁর ব্যাকরণ বিশেষ কোনো প্রভাব বিস্তার করে নি।

পাণিনির মাধ্যমে প্রাচীন ভারতে যে ব্যাকরণচর্চার সূত্রপাত ঘটে, তা কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির মাধ্যমে বিকশিত হয়ে উঠেছিল। কাত্যায়ন পাণিনির বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন বলেই পাণিনি সম্পর্কে সকলের মনে আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। কাত্যায়নের 'বার্তিক সূত্র' সমালোচনামূলক গ্রন্থ ছিল। একই সঙ্গে গ্রন্থটি ছিল মৌলিক। আবার পতঞ্জলি পাণিনির সূত্রের সমর্থনে রচনা করেন 'মহাভাষ্য'। এখানেও পাণিনির ব্যাকরণের বিরুদ্ধ সমালোচনা আছে। তবে পাণিনির 'অষ্টাধ্যয়ী' ব্যাকরণকে অবলম্বন করেই কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির ব্যাকরণ রচনার সূত্রপাত হয়। পাণিনিকে বলা হয় আদিমতম বৈয়াকরণ বা মুনি। আর কাত্যায়ন ও পতঞ্জলিকেও কম শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয় না। পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলিকে একত্রে 'মুনিত্রয়' বলে সম্মান দেওয়া হয়।

এবারে ভর্তৃহরির প্রসঙ্গ। প্রাচীন ভারতে চন্দ্রগোমীর পর উল্লেখযোগ্য বৈয়াকরণ ভর্তৃহরির জীবনকাল ৪৯৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৫৫১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য দুটি গ্রন্থের নাম হল—

(১) বাক্যপদীয়

(২) রাবণবধ

'বাক্যপদীয় গ্রন্থটি ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক। কিন্তু 'রাবণ বধ' গ্রন্থটি কাব্য। যাই হোক গ্রন্থ দুটি নিয়ে গবেষকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। গবেষকদের মতে 'বাক্যপদীয়' গ্রন্থটির রচয়িতা ভর্তৃহরি ও 'রাবণ বধ' গ্রন্থের ভর্তৃহরি হলেন আলাদা ব্যক্তি। এই প্রসঙ্গে কবির নিজের একটা উক্তি থেকে এই সমস্যার কিছুটা সমাধান করা সম্ভব হয়। ভর্তৃহরির উক্তিটি ছিল এইরকম—

> "দীপতুল্যঃ প্রবন্ধোহয়ং শব্দলক্ষণ চক্ষুষাম্ঃ"

আসলে ভর্তৃহরি তাঁর ব্যাকরণ গ্রন্থটিতে যে সব নিয়ম সূত্রবদ্ধ করেছিলেন, তারই দৃষ্টান্ত তিনি তাঁর মহাকাব্যে এনেছেন। তাই বলা যায় উপরোক্ত গ্রন্থদুটির লেখক ভর্তৃহরি। ভর্তৃহরি ৫৪১ খ্রিস্টাব্দে 'বাক্যপদীয়' গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটি বিশ্লেষণে দুটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়—

(১) 'বাক্যপদীয়' গ্রন্থটি পদ্যবন্ধ ছন্দে রচিত। ভর্তৃহরি প্রাচীন ভারতে ব্যাকরণকে গদ্যে বিশ্লেষণ করেছেন।

(২) এই গ্রন্থটিতে ভাষার গঠনগত বিশ্লেষণের চেয়ে দার্শনিকতত্ত্ব উদ্‌ঘাটনের প্রবণতা বেশি।

সংস্কৃত ব্যাকরণের ধারায় ভর্তৃহরির এই বৈশিষ্ট্য বিশেষ দৃষ্টিপাত করে। দীর্ঘকাল পরে বাংলায় নব্য বৈয়াকরণিক গোষ্ঠী ভাষার দার্শনিক দিক আলোচনায় গভীর সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু এর সূচনা হয়েছিল ভর্তৃহরির ব্যাকরণে।

ভর্তৃহরির ব্যাকরণের প্রায় সমসাময়িক রচনা হল জয়াদিত্য ও বামন রচিত 'কাশিকাবৃত্তি' (৬৫০ খ্রি:) মূলত পাণিনির ব্যাকরণের ব্যাখ্যা। পাণিনির ধারার পরবর্তীকালের আর এক জন উল্লেখযোগ্য বৈয়াকরণ হলেন টকব্যাট। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'প্রদীপ'। আর এই ধারার শেষ কৌমুদী। এখানে ভট্টোজি, পাণিনির সূত্রগুলিকে যুগের প্রয়োজনে নতুন করে সাজিয়ে এদের টীকা ব্যাখ্যা করেছিলেন।

উপসংহারে বলা যায় প্রাচীন ভারতের ভাষাবিজ্ঞানের যে সমৃদ্ধি সাধিত হয়েছিল, তা বিকাশলাভ করেছিল মূলত ব্যাকরণচর্চার মধ্য দিয়ে। ভারতবর্ষে ব্যাকরণচর্চার সূত্রপাত পাণিনির হাতেই যথার্থভাবে হয়েছে সত্য, কিন্তু পাণিনির আগে ও পাণিনি পরবর্তীতে কাত্যায়ন, পতঞ্জলি ও ভর্তৃহরির রচনায় ব্যাকরণের ধারা আরও সংশোধিত ও পরিমার্জিত রূপে প্রকাশ পেয়েছে। তাই প্রাচীন ভারতে ব্যাকরণচর্চা বা ভাষাবিজ্ঞান চর্চার এঁদের কথা ভোলার নয়।

৩০৩.১.৩.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। পাণিনি পরবর্তীযুগে কাত্যায়ন, পতঞ্জলি প্রমুখের হাতে ভাষাতত্ত্বচর্চার বিকাশ কীভাবে হয়েছিল, তা আলোচনা করো।

২। ভাষাতত্ত্বচর্চায় কাত্যায়ন, পতঞ্জলি ও ভর্তৃহরির অবদান লেখো।

৩০৩.১.৩.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা (১৪০৩)—ড. রামেশ্বর শ, পুস্তক বিপণি।

২। 'ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৯৬)—সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

৩। 'আধুনিক ভাষাতত্ত্ব' (১৯৯৭)—আবুল কালাম মনজুর, মোরশেদ, নয়া উদ্যোগ।

৪। 'ভাষাতত্ত্ব' (১৩৯৬)—রফিকুল ইসলাম, উজ্জ্বল বুক স্টোরস্।

৫। 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৯৮)—মহম্মদ শহীদুল্লাহ্, মাওলা ব্রাদার্স।

৬। 'ভাষাবিদ্যা পরিচয়' (২০০২)—অধ্যাপক পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, জয়দুর্গা লাইব্রেরি।

৭। 'ভাষা পরিক্রমা' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ২০০২)—অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মজুমদার, দেজ পাবলিশিং।

৮। 'ভাষা দেশ-কাল' (২০০০)—পবিত্র সরকার, মিত্র ও ঘোষ।

৯। 'ভাষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধাবলী' (১৯৯৮)—রফিকুল ইসলাম, বাংলা একাডেমি।

১০। 'ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা' (২০০৪)—অনিমেষকান্তি পাল, বামা পুস্তকালয়।

১১। 'বাঙালির ভাষাচিন্তা' (২০০২)—সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

১২। 'বাঙালির ভাষাচিন্তা' (সমাজভাষা, ২০০৩)—সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

১৩। 'বাংলা গদ্য স্টাইলিস্টিকস্' (২০০১)—নবেন্দু সেন, মহাদিগন্ত।

১৪। 'ফলিত ভাষাবিজ্ঞান' (১৯৯৭)—ভূদেব বিশ্বাস ও ভবদেব বিশ্বাস, তাহেরপুর কবিতা কুটির।

১৫। 'শৈলীবিজ্ঞান' (১৯৯৮)—অপূর্ব দে, মডার্ন বুক এজেন্সি।

১৬। 'সাহিত্যালোচনা ও শৈলীবিজ্ঞান' (১৯৯৪)—আশিস দে, পুস্তক বিপণি।

একক - ৪

ভর্তৃহরি

বিন্যাস ক্রম :

৩০৩.১.৪.১ : ভর্তৃহরি

৩০৩.১.৪.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০৩.১.৪.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩০৩.১.৪.১ : ভর্তৃহরি

ত্রিমুনি ব্যাকরণের পরবর্তীকালে সংস্কৃত ব্যাকরণ-দর্শনের বিষয়টি পরিপুষ্টি লাভ করে। আর সংস্কৃত ব্যাকরণ-দর্শনের প্রধান ব্যক্তিত্ব ভর্তৃহরি। তাঁর 'বাক্যপদীয়' গ্রন্থটি এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থরূপে বিবেচিত হয়। তাঁর সময়কাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। বৌদ্ধ দার্শনিক দিগনাগ-এর সমসাময়িক হিসেবে ধরলে ভর্তৃহরিকে পঞ্চম শতাব্দীর লোক বলতে হয়। সাধারণভাবে মনে করা হয় তিনি সপ্তম শতাব্দীর লোক। তিনি প্রখ্যাত পণ্ডিত আচার্য বসুরাত এর শিষ্য ছিলেন। তাঁর নামে বিভিন্ন গ্রন্থ প্রচলিত আছে। তার মধ্যে ব্যাকরণশাস্ত্র বিষয়কগ্রন্থ-'বাক্যপদীয়', 'বাক্যপদীয়'-এর ওপর রচিত স্বোপজ্ঞ টীকা, পতঞ্জলির মহাভাষ্যের ওপর লেখা টীকা 'মহাভাষ্যদীপিকা', 'ভাগবৃত্তি', 'শব্দধাতু সমীক্ষা' প্রভৃতি। এর মধ্যে 'বাক্যপদীয়' গ্রন্থখানিই সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায়, 'স্বোপজ্ঞটীকা' এবং 'মহাভাষ্যদীপিকা'র কিছু অংশ পাওয়া যায়, 'শব্দধাতু সমীক্ষা' পাওয়া যায় না। কেউ কেউ ভর্তৃহরিকে 'ভট্টিকাব্যম্' তথা 'রাবণবধম্' কাব্যের রচয়িতা বলে মনে করেন। তিনখানি শতককাব্যও তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে—'শৃঙ্গারশতক', 'নীতিশতক' এবং বৈরাগ্যশতক'। 'বাক্যপদীয়' অবলম্বনেই তাঁর ব্যাকরণ-দর্শনের দিকটি আলোচনা করবো।

'বাক্যপদীয়' গ্রন্থরচনায় তিনি গুরু বসুরাতের কাছ থেকে শব্দবিদ্যা সম্পর্কে বিশেষ উপদেশ লাভ করেন। তিনি তাঁর পূর্বাচার্য্যদের- পাণিনি, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি, ব্যাড়ি, বাজপ্যায়ন-প্রামাণিক গ্রন্থসমূহ পর্যালোচনা করে এই মহাগ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটি 'আগম-সংগ্রহ' বা 'আগম-সমুচ্চয়' নামেও বহুস্থানে উল্লিখিত হয়েছে। শব্দশাস্ত্রবিষয়ক এই গ্রন্থটি তিনটি কাণ্ডে বিভক্ত-ব্রহ্মকাণ্ড, বাক্যকাণ্ড, প্রকীর্ণকাণ্ড। এজন্য এই গ্রন্থকে অনেক সময় 'ত্রিকাণ্ডী' নামেও অভিহিত করা হয়। 'ব্রহ্মকাণ্ডে'র অপর নাম 'আগমকাণ্ড' এবং প্রকীর্ণকাণ্ডের অপর নাম 'পদকাণ্ড'। ব্রহ্মকাণ্ডেই শব্দানুশাসন-তত্ত্ব ও ব্যাকরণের গভীর দার্শনিক আলোচনা আছে। উপনিষদে যেমন আত্মতত্ত্ব বা আত্মজিজ্ঞাসাই মুখ্য, ভর্তৃহরির কাছে তেমনি শব্দতত্ত্বই একমাত্র সত্য। শব্দ-ই ব্রহ্ম, শব্দ-ই পরমজ্যোতিঃ।

অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্।

বিবর্ততেহর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ।।

ভর্তৃহরি হলেন শব্দাদ্বৈতবাদের প্রবক্তা। তাঁর মতে শব্দাত্মক ব্রহ্ম অনাদি, নিধনরহিত, অক্ষর, নিত্য। এই শব্দব্রহ্ম থেকেই অর্থরূপে জগতের প্রক্রিয়ারূপ বিবর্তহয়ে থাকে। অর্থাৎ তাঁর মতে জগৎ শব্দব্রহ্মেরই বিবর্ত। এজন্য তাঁকে শব্দবিবর্তবাদের প্রবক্তা বলা হয়। এই শব্দব্রহ্ম নিছক কানে শোনা ধ্বনি নয়-স্ফোটাত্মক নিত্যশব্দ। বেদের প্রথম অঙ্গ হিসাবে ব্যাকরণকে দেখানো হয় বলে তিনি জানান-

আসন্নং ব্রহ্মণস্তস্য তপসামুত্তমং তপঃ।

প্রথমং ছন্দসামঙ্গং প্রাহুর্ব্যাকরণং বুধাঃ।। [কারিকা ১১]

এই ব্যাকরণ ব্রহ্মের অতি কাছের বস্তু। তপস্যার থেকেও উত্তম তপস্যা এই ব্যাকরণ চর্চা। বেদের ষড়ঙ্গের ক্রমিক তালিকায় যেহেতু ছন্দের আগে ব্যাকরণ আছে তাই ছন্দ ইত্যাদি অঙ্গের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই ব্যাকরণ। ব্রহ্মকাণ্ডের আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে স্ফোট ও তার নানা বিভাগ- স্ফোট, ধ্বনি ও নাদ বা ঘোষের (Voicing) পারস্পরিক প্রভেদ, ব্যাকরণাগমের প্রয়োজন, মোক্ষের স্বরূপ, মোক্ষলাভের পন্থা ইত্যাদি। তাঁর মতে ব্যাকরণ হল অপবর্গ বা মোক্ষপ্রাপ্তির প্রধান সোপান—

"ইদমাদ্যং পদস্থানং সিদ্ধিসোপান- পর্বাণাম্।

ইয়ংসা মোক্ষ্মামাণামজিহ্মা রাজপদ্ধতিঃ।" [বাক্যপদীয় ১/১৬]

গ্রন্থের দ্বিতীয়কাণ্ড তথা বাক্যকাণ্ডে বাক্যের স্বরূপ বিবেচিত হয়েছে এবং প্রকীর্ণকাণ্ডে দ্রব্য, গুণ, জাতি, দিক, কাল, ক্রিয়া প্রভৃতি বিষয় পর্যালোচিত হয়েছে। ব্যাকরণ যাবতীয় অশুদ্ধ শব্দের চিকিৎসাস্বরূপ। পরম ব্রহ্মের জ্ঞান ব্যাকরণের জ্ঞানের দ্বারা লাভ করা যায়। ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়- শব্দ, অর্থ আর সম্বন্ধ এই তিন বিষয় নিয়ে অষ্টাবিধ তত্ত্ব। তিনি প্রথম অর্থের ভেদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। অর্থের প্রথম ভেদ হল অপোদ্ধার পদার্থ। তাঁর মতে অখণ্ড বাক্যই একমাত্র অর্থবোধক হয়। বাক্যার্থও অবিভাজ্য। তিনি মনে করেন,

বাক্যের অন্তর্গত পদ এবং পদের অন্তর্গত প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের বাস্তব অস্তিত্ব নেই। অর্থের দ্বিতীয় ভেদ হল স্থিতলক্ষণাঃ।

শব্দতত্ত্বের স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম রূপ রয়েছে। স্তরভেদে যাদের তিনি বলেন, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী বাক একে ত্রয়ীবাকবলে। তাঁর মতে স্ফোট নিত্য। তাই তাকে কাল বা সময় দিয়ে সাজানো যায় না। একমাত্র অনিত্য বিষয়কেই সময় বা কাল দিয়ে সজ্জিত করা সম্ভবপর। বর্ণ-স্ফোট, পদ-স্ফোট আর বাক্য-স্ফোট নিত্য। তাই কালভেদ দিয়ে তাদের চিহ্নিত করা যায়না। আর তাই কালগত মাত্রাগত পার্থক্য পাওয়া যায়। এখানেই পতঞ্জলির ভাবনার সঙ্গে ভর্তৃহরির স্ফোট বিষয়ক ভাবনার পার্থক্য। নাদ বা ঘোষই তাঁর কাছে স্ফোট। ভর্তৃহরির কাছে তা নয়। 'নাদ' হল 'অভিব্যঞ্জক ধ্বনি'। যাকে অধিধ্বনি বা Supra-segmental sound বলি। সেই কারণেই তা অনিত্য। 'নাদ' এর ধর্ম বর্ণ- স্ফোট এবং বাক্য- স্ফোট এর মাধ্যমে প্রকাশ পায়। নাদভেদের জন্যই স্ফোটাত্মক শব্দের কালভেদ ঘটে। নাদভেদের জন্যই বর্ণ-বাক্য-পদের 'বৃত্তিকাল' আর 'স্বকাল' — এই দুই প্রকার কালভেদ পাওয়া যায়। বৃত্তিকাল হল—দ্রুত, মধ্যম বিলাম্বিতা-এই তিন প্রকার ধ্বনির উপলব্ধিভেদ। হ্রস্ব বা একমাত্রা, দীর্ঘ বা দুমাত্রা, প্লুত বা তিনমাত্রা ইত্যাদি ভেদকে 'স্বকাল' গত ভেদ বলা হয়। বৃত্তিকালকে বলা হয় 'ব্যাকৃত ধ্বনি' আর 'স্বকাল' হল 'প্রাকৃত ধ্বনি'। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত ইত্যাদি স্বকাল ভেদ হল Segmental বা ধ্বনিখণ্ডের বৈশিষ্ট্য। ধ্বনির স্ব-লক্ষণ দিয়ে ভেদ বা পার্থক্য চিহ্নিত হয় আর বৃত্তিকাল হল Duration বা স্থায়িত্ব। একে Supra-segmental বা অধিধ্বনিগত বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখা যায়। ব্রহ্মস্বরূপ এই স্ফোটের কালগত যে ভেদ আমরা উপলব্ধি করি তা আসলে একটি মিথ্যা উপলব্ধি বলে ভর্তৃহরি জানিয়েছেন। ভর্তৃহরি তাঁর ব্যাকরণ আলোচনায় শরীরের তুলনায় মনকে বেশি প্রাধান্যদিয়েছেন। মনের অন্তর্গত জ্ঞানকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি ব্যাকরণ শাস্ত্রকে স্মৃতিশাস্ত্ররূপেব্যাকরণস্মৃতি এই নাম দিতে চেয়েছেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে চরক-সংহিতা যেমন স্মৃতিশাস্ত্র, তেমনি স্ফোটতত্ত্বের মাধ্যমে ভর্তৃহরির ব্যাকরণ স্মৃতিশাস্ত্র। ব্যাকরণ স্মৃতিশাস্ত্র হিসাবে আমাদের ভাষার সংস্কার সাধন করে থাকে, আমাদের মনের ও বুদ্ধির সংস্কারও। অনেকে স্ফোটতত্ত্বের সঙ্গে আধুনিক ধ্বনিবিজ্ঞানের আর্টিকুলারি ফোনেটিক্স, অ্যাকাউসটিক্স ফোনেটিকস অডিটরি ফোনেটিক্স এর তত্ত্বকে মেলাতে চান। কিছু সাদৃশ্য থাকলেও আধুনিক ধ্বনি-বিজ্ঞান এই অধিভাষাকে গ্রহণ করতে চায়না। যাই হোক, ব্যাকরণ-দর্শনের ধারায় আচার্য ভর্তৃহরির তত্ত্বকে সামনে রেখে পরবর্তীতে অনেকগুলো অভিমুখই উন্মোচিত হয়ে যায়।

৩০৩.১.৪.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. ব্যাকরণ-দর্শনের ধারায় ভর্তৃহরির ব্যাকরণ কতটা উপযোগী বলে তুমি মনে করো।

৩০৩.১.৪.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. সাধারণ ভাষাবিজ্ঞানও বাংলা ভাষা — ড. রামেশ্বর শ'

২. বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ — ড. নির্মল দাশ

৩. ভাষামনন বাঙালি মণীষা — পবিত্র সরকার

৪. ভাষাচর্চা ভাষাপ্রস্থান — নীলিমা চক্রবর্তী ও উদয়কুমার চক্রবর্তী

পর্যায় গ্রন্থ - ২

একক - ৫

হেমচন্দ্র

বিন্যাস ক্রম :

৩০৩.২.৫.১ : হেমচন্দ্র

৩০৩.২.৫.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০৩.২.৫.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩০৩.২.৫.১ : হেমচন্দ্র

অপাণিনীয় ব্যাকরণ সম্প্রদায়ের ইতিহাসে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের গুরুত্বও কম নয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'হৈম ব্যাকরণ'। রচয়িতা হেমচন্দ্র সুরি। তাঁর ব্যাকরণ রচনার সময়কাল দ্বাদশ শতাব্দী। হেমচন্দ্র ছিলেন একজন জৈন আচার্য। ড. ভেলভালকারের মতে, তিনি ১১৪৫ বিক্রমাব্দে (১০৮৮/১০৮৯ খ্রিস্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন আমেদাবাদ জেলার ধন্দুকা (Dhanduka) নামক স্থানে। অল্প বয়সে তিনি জৈনধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর ধর্মশাস্ত্র ও জ্ঞানার্জনের জন্য নানান গ্রন্থ নিষ্ঠার সঙ্গে পাঠ করেন। ব্যাকরণ গ্রন্থের পাশাপাশি যোগশাস্ত্র বিষয়েও গ্রন্থ রচনা করেন।

গ্রন্থ : প্রভাচন্দ্রের দেওয়া বিবরণ থেকে জানা যায়, ব্যাকরণ বা শব্দশাস্ত্র বিষয়ে তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা ১২টি। এছাড়াও দ্ব্যশ্রয়কাব্য, স্তবমালা, কাব্যানুশাসন, অলংকারচূড়ামণি প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। ব্যাকরণ বিষয়ক তাঁর প্রধান গ্রন্থের নাম 'হৈম ব্যাকরণ'। এর প্রকৃত নাম 'সিদ্ধহেম চন্দ্রাভিধস্বোপঞ্চশব্দানুশাসন'; সংক্ষেপে 'সিদ্ধহেম শব্দানুশাসন'।

গ্রন্থপরিচয় : পূর্ববর্তী বৈয়াকরণদের বিষয়বস্তু একত্রিত করে গ্রন্থে বিন্যস্ত করেন তিনি। বিশেষ করে শাকটায়নের ব্যাকরণের অনুসরণ করেন তিনি। হেমচন্দ্রের এই ব্যাকরণে আছে ৮টি অধ্যায়। প্রত্যেক

অধ্যায় চারটি করে পদে বিভক্ত। এতে মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী, অর্থমাগধী, পৈশাচী, চূলিকা পৈশাচী এবং অপভ্রংশ ভাষার লক্ষণের বিস্তৃত বিবরণ আছে। প্রথম ৭টি অধ্যায়ে সংস্কৃত ভাষার সূত্র ও অষ্টম অধ্যায়ে প্রাকৃত ভাষার সূত্র আলোচিত হয়েছে। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে, হৈম ব্যাকরণের মোট সূত্রসংখ্যা ৪৬৮৫ (৩৫৬৬+১১১৯)। এই ব্যাকরণের আনুষঙ্গিক অঙ্গগুলি হল পঞ্চাঙ্গের অন্তর্গত ধাতুপাট, গণপাট, উনাদিসূত্রপাট, লিঙ্গানুশাসন। ব্যাকরণ আলোচনার পূর্ণতা সাধনের জন্য তিনি এই আনুষঙ্গিক অঙ্গগুলির আলোচনা করেছেন। তিনি নিজের ব্যাকরণ গ্রন্থের ওপর দুটি বৃত্তি রচনা করেছেন—১. বৃহদবৃত্তি, ২. লঘুবৃত্তি। এছাড়াও প্রাকৃত অংশের উপরেও তিনি প্রকাশিকা নামে একটি বৃত্তি রচনা করেন। তিনি 'দেশীনামমালা' নামক প্রাকৃত অভিধান ও শব্দকোষ রচনা করেন। এটি অন্য নামেও পরিচিত। যথা—রত্নাবলী, দেশীশব্দসংগ্রহ, দেশীশব্দসংগ্রহবৃত্তি ইত্যাদি। দেশি শব্দের সংজ্ঞায় তিনি বলেন—"যে সমস্ত শব্দ লক্ষণের দ্বারা সিদ্ধ নহে এবং যে সমস্ত শব্দ সংস্কৃতাভিধানেও প্রসিদ্ধ নহে এবং যেগুলি গৌণলক্ষণাশক্তির দ্বারা সম্ভব নহে সেই সূত্রগুলিকে এখানে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।" হেমচন্দ্র যে সমস্ত শব্দ লিপিবদ্ধ করেছেন তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সেই শব্দগুলি আর্যভাষা থেকে দূরবর্তী ছিল। তাঁর পর্যবেক্ষণীতে দেখা গেছে, দেশি শব্দের দেশে দেশে এতটাই পার্থক্য যে সমস্ত দেশি শব্দ সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য। তাই বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ শব্দগুলো নিয়েই তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন। প্রাকৃত অভিধান ও শব্দকোষ রচনা করতে গিয়ে তিনি ৩৯৭৮টি দেশি শব্দ এবং তার টীকা দিয়েছেন। আর্যা ছন্দে রচিত ৭৮৩টি শ্লোকের মধ্যে ৭৮২টি শ্লোক দেশি শব্দের পরিচয় ও তার অর্থ নিয়ে রচিত। প্রতিটি প্রাকৃত শ্লোকের সংস্কৃত অনুবাদ শ্লোক রচনা করে তিনি এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেন। 'দেশীনামমালা' গ্রন্থটি আটটি বর্গে বিভক্ত। বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এই বর্গগুলি অক্ষর ও গাথাসংখ্যা দিয়ে একটি সারণীতে দেখিয়েছেন। প্রথম বর্গ আদিতে স্বরবর্ণ আছে এমন শব্দ নিয়ে রচিত। গাথাসংখ্যা ১৭৪টি। এভাবে দ্বিতীয় বর্গ থেকে ষষ্ঠ বর্গ পর্যন্ত যথাক্রমে ক-বর্গ, চ-বর্গ, ট-বর্গ, ত-বর্গ এবং প-বর্গযুক্ত শব্দ নিয়ে গঠিত। সপ্তম বর্গ অন্তঃস্থ বর্ণ এবং অষ্টম বর্গ উষ্ণ বর্ণ নিয়ে রচিত। আর গাথাসংখ্যা যথাক্রমে—১১২, ৬২, ৫১, ৬৩, ১৪৮, ৯৬ এবং ৭৭টি। ভারতে মধ্যযুগে আঞ্চলিক ভাষাকে গুরুত্ব দিতে আরম্ভ হয় মূলত হেমচন্দ্র থেকেই। তাঁর গুরুত্ব তাই অস্বীকার করা যায় না।

৩০৩.২.৫.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. হেমচন্দ্রের ব্যাকরণ তথা হৈম-ব্যাকরণের মূল দিকগুলি পর্যালোচনা করো।

৩০৩.২.৫.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. সাধারণ ভাষাবিজ্ঞানও বাংলা ভাষা — ড. রামেশ্বর শ'

২. বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ — ড. নির্মল দাশ

৩. ভাষামনন বাঙালি মণীষা — পবিত্র সরকার

৪. ভাষাচর্চা ভাষাপ্রস্থান — নীলিমা চক্রবর্তী ও উদয়কুমার চক্রবর্তী

পর্যায় গ্রন্থ -২

একক- ৬

মানোএল

বিন্যাস ক্রম :

৩০৩.২.৬.১ : ভূমিকা

৩০৩.২.৬.২ : গ্রন্থপরিচয়

৩০৩.২.৬.৩ : গ্রন্থবৈশিষ্ট্য

৩০৩.২.৬.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০৩.২.৬.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩০৩.২.৬.১ : ভূমিকা

ইউরোপীয় অভিযাত্রীদলের প্রেরণাতেই বাংলা ব্যাকরণের আত্মপ্রকাশ ঘটে। বিদেশি আগন্তুকের ভারতে আগমনের উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্য বিস্তার, সাম্রাজ্য বিস্তার ও ধর্মপ্রচার। আর সেই উদ্দেশ্যেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশার প্রয়োজনে এদেশের ভাষা শিখতে হয়েছিল, পরবর্তী স্বদেশী আগন্তুকদের সুবিধার জন্য নিজেদের ভাষায় এদেশের প্রাদেশিক ভাষার ব্যাকরণ লেখার প্রেরণা অনুভব করেছিল। আর এক্ষেত্রে প্রথম উদ্যোগী হন পর্তুগীজ মিশনারীগণ। তাদের বাংলা ভাষার অনুশীলন কর্মকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়—১. অনুবাদ ২. বঙ্গভাষার মৌলিক ধর্মনিবন্ধ ৩. বাংলা ভাষা- শিক্ষণের উপযোগী ব্যাকরণ ও কোষগ্রন্থ। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ প্রণয়নে পর্তুগীজ পাদ্রিরাই প্রথম পথিকৃৎ। প্রথম ব্যাকরণবিদ মানোএল দা আস্‌সুম্পসাঁও এর নাম স্মরণীয়।

৩০৩.২.৬.২ : গ্রন্থপরিচয়

মানোএল-এর রচিত গ্রন্থের নাম— Vocabularioemidiomabengalla e portuguezdivididoem duas partes অর্থাৎ 'বাঙ্গালা ও পর্তুগীজ ভাষার শব্দকোষ দুই ভাগে বিভক্ত।' প্রথম ভাগে স্থান পেয়েছে বাংলা

ভাষার বৈয়াকরণসূত্র ও শেষভাগে বাংলা-পর্তুগীজ, পর্তুগীজ-বাংলা শব্দকোষ। গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগালের লিসবন থেকে। তাঁর অপর গ্রন্থ 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে মানোএল-এর লেখা গ্রন্থটির দুটি প্রতিলিপি দেখতে পান। তার মধ্যে একটি সম্পূর্ণ, অপরটি খণ্ডিত। আকারে ক্ষুদ্র মানোএল এর বইয়ের পৃষ্ঠাসংখ্যা অ, ৫৯২, তার ক্রম নিম্নরূপ—

প্রথম দশ পৃষ্ঠা—ভূমিকা ও অন্যান্য বিষয়

১-৪০ পৃষ্ঠা—ব্যাকরণ

৪১-৫৯২ বাঙ্গালা শব্দ সংগ্রহ, তার বিভাজন এইরূপ—

৪১-৩০৬ বাঙ্গালা-পর্তুগীজ শব্দ

৩০৭-৫৭০ পর্তুগীজ-বাঙ্গালা শব্দ

৫৭১-৫৯২ বিভিন্ন ধরনের শব্দ শ্রেণী হিসাবে গৃহীত হয়েছে।

যথা: তিথির নাম, সংখ্যাবাচক নাম, সপ্তগ্রহের নাম, হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের নাম, গায়ত্রী মন্ত্র, ঈশ্বরের গুণাবলী এবং সমোচ্চার্য বাংলা শব্দাবলী। গ্রন্থখানি রচিত হয়েছে মূলত ধর্মপ্রচারকদের ভাষাশিক্ষার জন্য। পর্তুগীজ ভাষায় রচিত হলেও তার আদর্শ লাতিন ব্যাকরণ। কারণ পর্তুগীজ ভাষা লাতিন ভাষার অপভ্রংশ বা লৌকিক রূপান্তর। তিনি বাংলা ভাষাকে লাতিন ভাষার আদলে বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন। মানোএল ভাষা-ভেদে বর্ণমালার বৈচিত্র্যের কথা জানতেন না। ধর্মযাজকের রক্ষণশীলতাবশত তিনি লাতিনকে সমস্ত ভাষার জননী ও লাতিন বর্ণমালাকেই সমস্ত ভাষার লিখনপ্রণালীর শুদ্ধ মানদণ্ড বলে বিচার করেছেন। মানোএল তার ব্যাকরণে বাংলা ভাষার রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্ব আলোচনা করেছেন। ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কে কিছুই বলেননি।

৩০৩.২.৬.৩ : গ্রন্থবৈশিষ্ট্য

অঞ্চল ভেদে ভাষার উচ্চারণে পার্থক্য দেখা যায়, মানোএল-এর পক্ষে সেই পার্থক্য লিপিবদ্ধ করা সম্ভব ছিল না। তবে লাতিন ভাষায় যে বানান পদ্ধতি তিনি অনুসরণ করেছেন সেই পদ্ধতি পরবর্তীকালে গবেষণার অনুসরণযোগ্য হয়ে উঠেছে। 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'-এর ভূমিকা থেকে জানা যায় গ্রন্থটি ভাওয়াল দেশে রচিত। তাই পূর্ববঙ্গের মৌখিক ভাষার উপরই তাঁকে বিশেষভাবে নির্ভর করতে হয়েছিল। পূর্ববঙ্গের উপভাষিক বৈশিষ্ট্য—অপিনিহিতির ব্যবহার (মাতৃকা > মাইয়া),মহাপ্রাণহীনতা (ভাগ্যমন্ত > বাগঘিয়মন্তী), সাধু ও চলিতের মিশ্রণ ইত্যাদি লক্ষ্য করা গেছে। শব্দ রূপের ক্ষেত্রে তিনি লাতিনের মত পদের অন্ত্যধ্বনি এবং সুপ্‌বিভক্তি অনুযায়ী বিশেষ্য পদের নানা শ্রেণীবিভাগ করেছেন। এই শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী তাঁর ব্যাকরণে বিশেষ্য শব্দগুলি স্বরান্ত, হলন্ত, সম্বন্ধে "র" এবং "এর" বিভক্তিযুক্ত চারটি "গণ" বাপ্রকরণে বিভক্ত হয়েছে। তাঁর শব্দরূপায়ণ লিঙ্গ নিরপেক্ষ যা বাংলা ভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য। লাতিন আনুগত্য মানোএল-এর শব্দরূপের অপর এক বৈশিষ্ট্য। শব্দ রূপেতি নিলাতিনের সাদৃশ্যে কর্তা (Nominativo), সম্বন্ধ (Genitivo),

সম্প্রদান (Dativo), কর্ম (Accestivo), সম্প্রদান (Vocativo), অপাদান (Ablativo)- এর জন্য ছয়টি বিভক্তির কথা বলেছেন। করণ ও অধিকরণ-এর জন্য পৃথক কোন বিভক্তির কথা বলেননি। লাতিনে অপাদান, করণ ও অধিকরণের জন্য একই বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। এই বিভক্তি ablative এবং এই কারকের নাম ablativus।

মানোএল-এর ব্যাকরণে শব্দ রূপের অপর বৈশিষ্ট্য—বিশেষ্য পদে কর্তৃকারক ছাড়া অপর কোন কারকের বহুবচনের রূপ তিনি প্রদর্শন করেননি। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য- "বাংলাশব্দের বহুবচন প্রযুক্ত হয় না, কারণ ইহা একবচনের তুল্য।' বিশেষণপদের শব্দরূপে বিশেষ্যপদের নিয়মকেই অনুসরণ করা হয়েছে দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সর্বনামের যে আটটি শ্রেণীর কথা বলেছেন—মানোএল-এর ব্যাকরণে তার সবকটা ভাগ পাইনা। মানোএল ব্যক্তিবাচক, দুধরনের নির্ণয় সূচক, সম্বন্ধবাচক, প্রশ্নসূচক, অনিশ্চয়সূচক এবং আত্মবাচক সর্বনামের কথা বলেছেন। সাকল্যবাচক এবং ব্যতিহারী সর্বনামের কথা বলেন নি। ব্যক্তিবাচক সর্বনামে তিন পুরুষের কথা বলা হয়েছে। পুরুষ অনুযায়ী সর্বনামের রূপ পরিবর্তনের কথাও বলেন তিনি। ক্রিয়ারূপ গঠনেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ধরা পড়ে। অস্ত্যর্থক "হ" ও "আছ্" ধাতু এবং "ক" ধাতু অবলম্বনে ক্রিয়ার নির্দেশক ও অনুজ্ঞা ভাবের রূপ প্রকাশ পেয়েছে। ক্রিয়ারূপে মাঝে মাঝে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে। যেমন—সামান্য অতীতের একবচন 'আমি হইলাউঁ, ভবিষ্যৎ একবচন 'আমি হইমুঁ', সাধারণ বর্তমান একবচন 'তু আছস', বহুবচনে 'তোরা আছস' ইত্যাদি। 'আছ' ধাতুর নিত্যবৃত্ত অতীতরূপে পুরুষভেদে 'আমি আছিতাম', 'তুই আছিতি', 'উ আছিত' ইত্যাদি রূপ দেখা গেছে।

ক্রিয়ারূপ সাধনে ঔপভাষিক বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করলেও মোটামুটি সাধু গদ্যের রূপ ও রীতি প্রতিষ্ঠার দিকেই মানোএল- এর লক্ষ্য ছিল। এছাড়া ক্রিয়া-বিশেষ্য ও অনির্দিষ্ট ক্রিয়াপদের রূপও সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন।

বাংলার বাক্যরীতি সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেছেন। এই অংশে বাক্যযোজনার ক্ষেত্রে অব্যয় বা ক্রিয়া বিশেষণের ব্যবহার, অতিশায়নবাচক বিশেষণের ব্যবহার কর্মভাববাচ্যে যৌগিক ক্রিয়া ব্যবহার, ক্রিয়া ব্যবহারের ক্ষেত্রে যৌগিক ক্রিয়া ব্যবহারের প্রাবল্য ও মৌলিক ক্রিয়া ব্যবহারের বিরলতা, বিভিন্ন কারকের প্রয়োগ তাৎপর্য, বিভিন্ন কারকের অর্থে ব্যবহৃত অনুসর্গ, বাক্যগঠন তথা পদগঠনরীতি ইত্যাদি নানা বিষয় আলোচিত হয়েছে। তবে পদগঠনে পর্তুগিজ, লাতিন ভাষার পদগঠনকেই সামনে রেখেছেন তিনি। যথা: xunilam ze Induxtani cala loc xocol অর্থাৎ শুনিলাম যে হিন্দুস্থানী লোকসকল কালা কৃষ্ণবর্ণ, অথবা Roman Pontir euchitnoheoporad corite—to be uchit xucarziocorite অর্থাৎ রোমান পন্থীর অপরাধ করা উচিত নহে। অচিরে সুকার্য করা উচিত। পদ সাধন ও বাক্য যোজনায় মিশ্ররীতির সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

তাঁর ব্যাকরণে ত্রুটি, সীমাবদ্ধতা আছে। কিন্তু বাংলা ব্যাকরণ রচনার প্রথম প্রয়াসকারী হিসেবে তাঁর অবদান অস্বীকার্য নয়। সংস্কৃতের সঙ্গে পরিচয় না রেখেও একান্ত অপরিচিত একটি বিদেশি ভাষাকে শুধু পর্যবেক্ষণ ও অনুশীলনের সাহায্যে বিশ্লেষণ করে তিনি যে সূত্রাবলী নির্দেশ করেছেন তা বিদেশি বাংলা ভাষা

শিক্ষার ক্ষেত্রে উপযোগী হয়েছিল। তাঁর ব্যাকরণের কিছু ঐতিহাসিক উপযোগিতা আছে। মানোএল-এর ব্যাকরণের উচ্চারণ পদ্ধতি, পদসাধনের সূত্র ও দৃষ্টান্তে আধুনিক বাংলার পূর্ববর্তী পর্যায়ের কিছু কিছু ঐতিহাসিক উপকরণ রক্ষিত হয়েছে। উনিশ শতকের গদ্য চর্চার যে ধারা, তার পূর্বরূপের হদিশ কিছুটা হলেও মানোএল-এর ব্যাকরণে পাওয়া যায়। ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর আলোচনা নেই, কিন্তু শব্দতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব, উচ্চারণ পদ্ধতি, পরিভাষা কোষ রচনায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

৩০৩.২.৬.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. মানোএল-এর ব্যাকরণ এর মূল দিকগুলি কী কী? বাংলা ব্যাকণের ধারায় তাঁর ব্যাকরণের উপযোগিতা বিচার করো।

৩০৩.২.৬.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ, ডক্টর নির্মল দাশ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

২. ভাষা মনন বাঙালি মনীষা : পবিত্র সরকার, পুনশ্চ

৩. সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, ড. রামেশ্বর শ", পুস্তক বিপণি

৪. ভাষাচর্চা- ভাষাপ্রস্থান, নীলিমা চক্রবর্তী উদয়কুমার চক্রবর্তী, শ্রীময়ী প্রকাশনী

একক-৭

হ্যালহেড

বিন্যাস ক্রম :

৩০৩.২.৭.১ : ভূমিকা

৩০৩.২.৭.২ : গ্রন্থপরিচয়

৩০৩.২.৭.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০৩.২.৭.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩০৩.২.৭.১ : ভূমিকা

বিদেশিদের দ্বারা বাংলা ব্যাকরণ চর্চার সূচনা হয় মানোএল-এর হাত ধরে। তাঁর মধ্যে কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। বিশেষ করে ধর্মীয় ক্ষেত্রে। হ্যালহেড সেই প্রতিবন্ধকতা দূর করে মুক্তমনে যত্নের সঙ্গে বাংলা ব্যাকরণ চর্চা করেছেন। তাঁর অনুশীলিত উদার মনের পরিচয় পাওয়া যায় ব্যাকরণ রচনার ধারায়। তাঁর জন্ম ওয়েস্টমিন্স্টারে। বিদ্যাচর্চার প্রাক্কালে ব্রিন্স্লি শেরিডান ও উইলিয়াম জোনসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। তাদের সান্নিধ্য ও সাহচার্যে অনুবাদ কর্ম এবং প্রাচ্যভাষা চর্চা করার প্রেরণা পান। পারিবারিক ও ব্যক্তিজীবনে মনোমালিন্যের জন্য হ্যালহেড ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে কেরানির চাকরি নিয়ে ১৭৭২-এ বাংলাদেশে আসেন। অল্প সময়ের মধ্যে আরবি, পারসি, বাংলা ও সংস্কৃত শিখে কোম্পানির তৎকালীন শাসনকর্তা ওয়ারেন হেস্টিংসের নজরে আসেন। হিন্দু ও মুসলমান আইন গ্রন্থ সংকলন ও অনুবাদ করেন। সমকালে ঔপনিবেশিকরা পারসি বা হিন্দুস্থানী ভাষাকেই সার্বভৌম ভাষা হিসাবে গণ্য করতেন। তখন বাংলা ছিল আঞ্চলিক ভাষা, সে ভাষা সম্পর্কে ঔপনিবেশিকরা সচেতন ছিল না, এ ভাষা অনুশীলনে আগ্রহও বোধ করতেন না। কিন্তু হ্যালহেড বাংলা ভাষার স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করেন, পৃথকভাবে বাংলা শিক্ষার অপরিহার্যতা অনুভব করেন।

৩০৩.২.৭.২ : গ্রন্থপরিচয়

হ্যালহেডের গ্রন্থের নাম "এ গ্রামার অফ দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ" (A Grammar of the Bengal Language) প্রকাশিত হয় ১৭৭৮এ। গ্রন্থে ভূমিকা ও পরিশিষ্ট বাদ দিয়ে ৮টি অধ্যায় আছে। ভূমিকা অংশে আছে ২৫ পৃষ্ঠা, ব্যাকরণ অংশে ২১৬ পৃষ্ঠা। অধ্যায়গুলির শিরোনাম — The Elements, of Noun, of Numbers, of

Pronouns, of Verbs, of Attributes and Relations, of the syntax, of Orthoepy and Versification. ভূমিকায় বাংলা ভাষা সম্পর্কে বাংলা ব্যাকরণ রচনার উপযোগিতা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। বাংলাদেশে সংস্কৃত ছাড়াও পারসি, হিন্দুস্থী, বাংলা ভাষা প্রচলিত থাকার সংবাদ দিয়েছেন। এই তিন ভাষার চরিত্র যে পৃথক, প্রয়োগ ক্ষেত্রেও যে পৃথক তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে পারসি রাজভাষা, হিন্দুস্থানী সর্বভারতীয় গণভাষা, বাংলা বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষের ভাষা। তাই বাংলাদেশে বাঙালির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে বাংলা জানা, বাংলা ভাষার চরিত্র বোঝা একান্ত আবশ্যক। বাংলা ব্যাকরণের নাম পত্রে তিনি সংস্কৃত শ্লোক ব্যবহার করেন। এর মধ্য দিয়ে ক্লাসিক গৌরব সঞ্চার করতে চেয়েছেন। ভূমিকার শেষাংশে বাংলাদেশে বাংলা ছাপার হরফ নির্মাণের ইতিহাস ও গুরুত্ব আলোচিত হয়েছে।

The Element নামক প্রথম অধ্যায়ে বর্ণপরিচয়, যুক্তব্যঞ্জন গঠন, উচ্চারণবিধি ইত্যাদি নানা দিকের সন্ধান দিয়েছেন। ভারতীয় লিপির লিখন পদ্ধতির কথা, লিখন পদ্ধতির ব্যবহারিক অসুবিধার কথা তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। বাংলা বর্ণমালা সংস্কৃতের মতোই ৫০টি। বর্ণমালা আলোচনায় বাংলা তথা সংস্কৃতের সঙ্গে ইংরেজি বর্ণমালার তুলনা করেছেন। তুলনায় সংস্কৃত বর্ণমালাকে অনেকাংশে অভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন করেন। বাঙালির ধ্বনি উচ্চারণ, যুক্তব্যঞ্জন গঠন, রেফ-এর ব্যবহার, যুক্তাক্ষর গঠনের পদ্ধতি, বিভিন্ন ধ্বনির জন্য একই বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছের ব্যবহার, লেখায় ধ্বনিবিচ্ছেদ বর্জন ও বাংলা সন্ধ্যাক্ষর সূত্র নির্দেশ, বাংলা ভাষার নমুনা ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ নানাদিকের সন্ধান আছে এ অধ্যায়ে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিঙ্গ- প্রকরণ ও লিঙ্গান্তরের নিয়ম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গ—এই তিন ভাগে ভাগ করেছেন। তাঁর মতে লিঙ্গ নির্ধারণ হয় শব্দের প্রাকৃতিক পরিচয় অনুযায়ী, শব্দের রূপ গঠন অনুযায়ী নয়। কারক বিভক্তি আলোচনায় সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার তুলনা করেছেন। তিনি পাঁচটি কারক ও চারটি বিভক্তির অস্তিত্ব লক্ষ করেছেন। পদগঠনের নিয়মও তাঁর ব্যাকরণে আলোচিত হয়েছে।

বচন বা 'Of Numbers' অধ্যায়ে তিনি শুধু একবচনের রূপই দেখিয়েছেন, দ্বি-বচন, বহু-বচন-এর যে বিধিবদ্ধ রূপ নেই তার কারণও অনুসন্ধান করেছেন। তিনি বলেছেন দ্বিবচন কোন আধুনিক ভাষাতেই নেই। একবচনের পদই সব ভাষায় সামূহিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। একবচন-এর পদের সঙ্গে একটি অনির্দিষ্ট বহুবচনবোধক epithet ব্যবহার করে বহুবচনের অর্থ বোঝানো যায়। একত্ব "এক" শব্দ, মনুষ্যবাচক শব্দে বহুত্ব বোঝাতে "লোক", "গণ", "দল", "গুলা", "দিগ" এর ব্যবহার কর্তৃপদের বহুবচনে "রা" বিভক্তির ব্যবহার করেছেন। সর্বনাম বা 'of pronouns' অধ্যায়ে pronouns-এর প্রতিশব্দ হিসাবে তিনি "নামবাচ্য" শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ইউরোপীয় ব্যাকরণে pronoun-এর যে পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হয় তা যথার্থ সর্বনাম কিনা তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তিনি। সর্বনামের রূপ বিশ্লেষণে তিনি বর্ণনামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। সর্বনাম গুলোকে তিনি ই-কারান্ত, এ-কারান্ত, বিভক্তি গ্রহণে অসমর্থ—এই তিনভাগে ভাগ করেছেন। ই-কারান্ত সর্বনাম: আমি, তুমি, আপনি, এই, ওই ইত্যাদি। এ-কারান্ত সর্বনাম এ, সে, জে, কে। এ-কারান্ত সর্বনামের মধ্যে কিছু সংখ্যাবাচক, কিছু সমূহবাচক এবং কিছুটা ব্যতিহার বাচক শব্দ যথা: একে, দুহে, সভে, সকলে, একে একে ইত্যাদি। বিভক্তি গ্রহণে অসমর্থ শ্রেণীর সর্বনাম হল "নিপাত" বা

"aptotes"-এগুলো সমস্তই অনির্দিষ্ট সর্বনাম। যথা: জত, তত, কত, কিবা, কেবা, কেহ। "নিজ" ও "আপ্ত"-দুটি আত্মবাচক সর্বনামের উল্লেখ করেন।

ক্রিয়া বা of Verbs অধ্যায়ে ক্রিয়ারূপের নানান দিকের সন্ধান দিয়েছেন। ক্রিয়ারূপ গঠনে ইউরোপ-এশিয়ার বিভিন্ন আধুনিক ভাষার ক্রিয়ারূপের আলোচনা করেছেন। গ্রিক ও সংস্কৃত ক্রিয়াপদ গঠনের সংক্ষিপ্ত তুলনা করেছেন, সহায়ক ক্রিয়া ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইংরেজি, পারসি, বাংলার সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য দেখিয়েছেন। ধাতুরূপের আলোচনায় সমস্ত ধাতুকে উপান্ত বর্ণের পার্থক্য অনুযায়ী তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন—ক. ধাতুর উপান্ত্য ব্যঞ্জনে অ-ধ্বনি নিহিত আছে, খ. এমন ধাতু যার শেষ বর্ণের আগে "ও" বসে- হওন, পাওন গ. যার উপান্ত্য বর্ণে "আ" যুক্ত আছে—ডরান, লিখান, খাওয়ান ইত্যাদি। ক্রিয়ার কালগঠনের সূত্রের কথা বলেছেন। বাংলা বাচ্য, ধাতু থেকে শব্দ গঠনের পদ্ধতি- ক্রিয়ারূপের আলোচনায় তুলনামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। 'Of Attributes and Relations' অধ্যায়ে বিশেষ্য, সর্বনাম, ক্রিয়াপদ ছাড়া বাক্যে ব্যবহৃত শব্দগুলিকে তিনি তিনভাগে ভাগ করেছেন। Adjective or Epithets বা শব্দ বিশেষণ, Connectives of Nouns or preposition বা শব্দযোগ, Attributes of Verbs বা ক্রিয়া বিশেষণ। তাদের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন এবং প্রয়োগের দীর্ঘ আলোচনা করেছেন উদাহরণ সহযোগে।

সংখ্যাশব্দ "of Numbers" অধ্যায়ে প্রথমেই শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচনা করেছেন, সংখ্যা শব্দগুলো ভারতেই উদ্ভূত হয়েছিল। তবে বাংলার 'denomination of cordinal numbers' তাঁর কাছে irregular মনে হয়েছে। তাই ১০০ পর্যন্ত বাংলা বিশুদ্ধ সংখ্যা শব্দের তালিকা দিয়েছেন। বাংলা সংখ্যাশব্দের কয়েকটি নতুন বৈশিষ্ট্য তিনি লক্ষ্য করেছেন—ক. প্রত্যেক দশকের নবম সংখ্যার নাম সংখ্যা প্রগতির সাধারণ নাম অনুসারে চিহ্নিত হয়না, তার ঠিক আগের ঊর্ধতন সংখ্যাক্রম অনুসারে নির্ধারিত হয়। যথা—twenty-nine নবিশ নয়, ঊনত্রিশ। এক্ষেত্রে তিনি বর্ণনাত্মক ভঙ্গি অবলম্বন করেছেন। বাংলা সংখ্যা শব্দগুলো আরবি বা সংস্কৃতের মত লিঙ্গ সাপেক্ষ নয়—এটাও তাঁর পর্যবেক্ষণে এসেছে। আধুনিক সংখ্যা শব্দের তালিকায় এমন কিছু শব্দ আছে যা বাংলায় দুর্লভ কিন্তু হিন্দিতে আছে। যথা: বত্তিশ, তেত্তিশ, আটতিশ। এছাড়া হিসাব-নিকাশের জন্য ব্যবহৃত নানা শব্দ পরিভাষার কথা বলেছেন তিনি। অন্বয়, Of the Syntax অধ্যায়ে বাংলা ভাষার সম্ভাবনার কথা, দেশীয় বৈয়াকরণের অভাবের কথা বলেছেন, সমকালে বাংলাভাষার অবনতির কারণগুলো পর্যালোচনা করেছেন। বাক্যের অন্বয়ের ক্ষেত্রে মধ্য ও আধুনিক বাংলার সন্ধিক্ষণের চিহ্ন লক্ষ করা গেছে। কারক একাধিক পদযোগে গঠিত হলে সর্বশেষে বিভক্তি বসে। সম্বন্ধ পদ সবসময় আগে বসে। কাব্যের খাতিরে অবস্থান পরিবর্তন হতে পারে। সাধারণ সম্বোধন- হে, এ, রে, আরে, স্ত্রীলোক ব্যবহৃত সম্বোধন- গো, আল। পুরুষবাচক সর্বনাম দিয়ে সম্বন্ধবাচক সর্বনামের কাজ চলে। বহুবচন বিশেষ্যে একবচনের ক্রিয়াপদ বসে। 'of orthoepy and Versification' অধ্যায়ে বাংলা কথ্যভাষার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি আধুনিক কথ্য উচ্চারণের কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যর কথা উল্লেখ করেছেন। দ্বিমাত্রিকতার কথা, অক্ষরপ্রসঙ্গ, মাত্রাপ্রসঙ্গ, কাব্যের শব্দ ও ছন্দরীতি বিষয়ে অল্পবিস্তর আলোচনা করেন। কাব্যভাষা সম্পর্কে তাঁর অভিমত প্রকাশ পেয়েছে।

হ্যালহেডের ব্যাকরণ বাংলা ভাষা ও বাংলা ভাষার ব্যাকরণের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। ভাষার ইতিহাস এর দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, যে সময়ে তিনি ব্যাকরণ লেখেন তখন বাংলাভাষার সন্ধিক্ষণ। তাই তাঁর ব্যাকরণে মধ্য যুগের সমাপ্তি ও আধুনিক যুগের সূচনা সন্ধিক্ষণের নিদর্শন আলোচিত হয়েছে। বাংলা ভাষা আলোচনার সূত্রে বাংলার সঙ্গে সংস্কৃত, পারসি, ইংরেজির প্রতিতুলনা এনেছেন। ইতিহাসের দিক দিয়ে বলা যায় তিনি সংস্কৃতজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও বাংলার বৈশিষ্ট্যগুলোকে সংস্কৃতির ছাঁচে দেখাবার চেষ্টা করেননি। বর্ণনামূলক দৃষ্টিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাষা বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি ব্যাকরণ চিন্তার যে ধারা প্রতিষ্ঠা করেন, পরবর্তী বৈয়াকরণদের পথ তাতে অনেকটাই সুগম হয়েছে। তিনি সর্বপ্রথম দেশের শাসন পদ্ধতির ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা তথা বাংলা ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করেছিলেন। কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে বাংলা ব্যাকরণ চর্চার উপযোগিতার কথা প্রচার করেন। একটা বিশেষ ধর্মগোষ্ঠী নয়, সর্বসাধারণের মধ্যে তাঁর ব্যাকরণ চর্চার ধারাকে সম্প্রসারণ করেছেন।

৩০৩.২.৭.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. বাংলা ব্যাকরণ চর্চার ধারায় হ্যালহেডের কৃতিত্ব বিচার করো।

২. হ্যালহেডের বাংলা ব্যাকরণের মূল বিষয়গুলো পর্যালোচনা করে বৈশিষ্ট্যগুলি লিপিবদ্ধ করো।

৩০৩.২.৭.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ, ডক্টর নির্মল দাশ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

২. ভাষা মনন বাঙালি মনীষা : পবিত্র সরকার, পুনশ্চ

৩. সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, ড. রামেশ্বর শ", পুস্তক বিপণি

৪. ভাষাচর্চা- ভাষাপ্রস্থান, নীলিমা চক্রবর্তী উদয়কুমার চক্রবর্তী, শ্রীময়ী প্রকাশনী

একক-৮

রামমোহন রায়

বিন্যাস ক্রম :

৩০৩.২.৮.১ : রামমোহনের গৌড়ীয় ব্যাকরণ

৩০৩.২.৮.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০৩.২.৮.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩০৩.২.৮.১ : রামমোহনের গৌড়ীয় ব্যাকরণ

বাংলা ভাষায় ব্যাকরণ রচনার প্রথম দিকে তিন ধরনের উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যাকরণ লেখা হয়েছিল। সেগুলো নিম্নরূপ—

১) বিদেশিদের দ্বারা বিদেশিদের জন্যে বাংলা ব্যাকরণ

২) এদেশিয় যারা বিদেশিদের জন্যে বাংলা ব্যাকরণ

৩) দেশিয় বৈয়াকরণের দ্বারা দেশিয়দের জন্যে বাংলা ব্যাকরণ

রামমোহন রায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধারার ব্যাকরণ রচয়িতা। তিনি ১৮২৬ সালে যে ব্যাকরণ গ্রন্থ লিখেছিলেন তার নাম ছিল 'Bangalee Grammar in the English Langauge' আর তাঁর বাংলা ব্যাকরণটির নাম 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' (১৮৩৩)। অনেকে বলেছেন ব্যাকরণটি তাঁর ইংরেজি ব্যাকরণের বাংলা অনুবাদ।

এই ব্যাকরণটি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, এখানে তিনি পদ-পরিচয়, বচন, লিঙ্গ, কারক, সমাস, প্রত্যয় ইত্যাদি সম্পর্কে বিশ্লেষণ করেছেন। অর্থাৎ রূপতত্ত্বের সমস্ত দিকই এখানে বর্তমান। এ ছাড়া ধ্বনিতত্ত্বের প্রসঙ্গ তো আছেই। সেখানে বর্ণরীতি, ধ্বনির উচ্চারণ স্থান বিশ্লেষণেও গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তিনি। এ ছাড়া বাক্যতত্ত্ব সম্পর্কিত কিছু কথা তিনি বলেছেন। বাক্য রচনার ব্যাপারটা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। এবারে বিষয়টি অধ্যায় ধরে ধরে কিছুটা আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রথম অধ্যায় : এখানে ধ্বনি বা বর্ণের প্রসঙ্গই উল্লেখ্য। তবে সেই আলোচনা তাত্ত্বিক না হলেও গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া গেছে। রামমোহন এখানে বর্ণের রীতি-নীতি, বর্ণ-উচ্চারণ, লিপিশুদ্ধি প্রকরণ প্রসঙ্গ ইত্যাদি আলোচনা করেছেন। বর্ণ উচ্চারণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ব্যাকরণের শ্রেণি বিভাজন, বিষয়বৈচিত্র্য, উচ্চারণ শুদ্ধতা, উচ্চারণবিধিতে নিপাতনে সিদ্ধ, অক্ষরসমূহের সংযোগ রীতি ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অধ্যায় : এই অধ্যায়ে প্রকরণ শিরোনামে চারটি পর্ব আছে। সূচনা অংশে তিনি উদাহরণ দিয়ে পদবিধানের কথা বলেছেন। তার পরেই অবশ্য বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের বিভাজন করেছেন ও উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন। এরপর নামের রূপ ও বচন বিষয়ে তাঁর বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষণীয়। এ ছাড়াও এই অধ্যায়ে তিনি লিঙ্গান্তর নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। পুং লিঙ্গ থেকে স্ত্রী লিঙ্গ, স্ত্রী লিঙ্গ থেকে পুং লিঙ্গ ইত্যাদি। এ ছাড়া ব্যতিক্রমী লিজনীতিও এখানে আলোচ্য। তিনি উদাহরণ দিয়েছেন এইভাবে "বাপ তাঁহার স্ত্রী মা, ভাই তাঁহার স্ত্রী ভাজ, বুন তাঁহার স্বামী বোনাই, মাসী তাঁহার স্বামী মেসো, আড়িয়া, গাই ইত্যাদি।"

স্থান নাম	**সংকুচিত নাম**
ক. পাটনার লোক বা বস্তু	পাটনাই
খ. নদিয়ার লোক বা বস্তু	নদিয়াই
গ. ভাগলপুরের লোক বা বস্তু	ভাগলপুরী

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে স্বভাববাচক তদ্ধিত শব্দের স্বরূপ ও উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন 'বানর' থেকে 'বানরামি', 'ছেলে' থেকে 'ছেলেমি', 'মনুষ্য' থেকে 'মনুষ্যত্ব', ধৈর্য থেকে 'ধীরতা' ইত্যাদি। তৃতীয় পরিচ্ছেদে সমাজকে নিয়ে বিধিবদ্ধ আলোচনা আছে। সমাজের স্বরূপ নির্ণয়, বৈচিত্র্য সবই আলোচনায় এসেছে। উদাহরণ দিয়ে তিনি বুঝিয়েছেন:

ক. বানরমুখো = বানরের ন্যায় মুখ

খ. মিষ্টমুখ = মিষ্ট হইয়াছে যাহার মুখ

গ. ভূপতি = ভূ অর্থাৎ যে পৃথিবীর পতি

এ ছাড়াও 'সমাসের অন্তঃপাতী' অংশে নাম ও সংখ্যাবাচক শব্দের শেষে টি, টা, গুলা, গুলি ইত্যাদি ব্যবহারের স্বরূপ নির্ধারণ করেছেন।

চতুর্থ অধ্যায় : এখানে নয়টি পরিচ্ছেদ আছে। অর্থাৎ চতুর্থ থেকে দ্বাদশ পরিচ্ছেদ। চতুর্থ পরিস্থলের নাম অবশ্য তিনি নিয়েছেন 'প্রতিসংজ্ঞার প্রকরণ'। এখানে পুরুষ, বচন ইত্যাদির প্রতিসংজ্ঞার স্বরূপ ইত্যাদি আছে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে গুণাত্মক বিশেষণ, বিশেষণ, ক্রিয়ার প্রকার, ধাতুরূপ, সংযোগ ক্রিয়া, হওন ক্রিয়া, যাওন ক্রিয়া, নিজন্ত ক্রিয়া, বাচ্য নিয়মের বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে। সপ্তম থেকে একাদশ পরিচ্ছেদ অবধি বিশেষণের বিভিন্ন শ্রেণিকে দৃষ্টান্তসহ বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ক্রিয়াপেক্ষ ক্রিয়াত্মক বিশেষণ। বিশেষণীয় বিশেষণ, সম্বন্ধীয় বিশেষণ, সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ, অন্তর্ভাব বিশেষণগুলি আলোচিত। অর্থাৎ এই পরিচ্ছেদগুলিতে বিশেষণের আলোচনা উদাহরণসহ এক নতুন রূপ পেয়েছে। বলা যায় বিশেষণের আলোচনায় এই পরিচ্ছেদগুলি সমৃদ্ধ। শেষে অর্থাৎ দ্বাদশ পরিচ্ছেদে অন্বয় প্রকরণ বা বাক্যতত্ত্বের কথা এখানে বিশ্লেষিত। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন পদের সংক্ষিপ্ত আলোচনাও আছে। তা ছাড়া এই অধ্যায়ের শেষে রামমোহন পয়ার, ত্রিপদী ইত্যাদি স্বরূপ ও প্রয়োগরীতি সম্পর্কে বিশ্লেষণ করেছেন।

এই ভাবে অধ্যায় ধরে ধরে লিঙ্গ, সমাস, কারক, ক্রিয়া, বচন ইত্যাদির বিশ্লেষণ করেছেন তিনি। উল্লেখ্য এই গ্রন্থটির পাঁচটি সংস্করণ হয়েছিল। এর কাঠামোটি ছিল আধুনিক ধাঁচের। রামমোহনের গৌড়ীয় ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্যগুলি এইরকম

এক. বাংলা ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ রামমোহনের 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'। কারণ এটিই ছিল কোনও বাঙালির লেখা প্রথম বাংলা ব্যাকরণ।

দুই. তৎকালে এই গ্রন্থটির পাঁচটি সংস্করণ হয়েছিল। প্রথমে এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৯৯। পরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১০৬।

তিন. এই ব্যাকরণটিকে অনেকে তাঁর ইংরেজি ব্যাকরণের হুবহু অনুবাদ বললেও, এটি যথেষ্ট মৌলিক। কারণ এই গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভাষাতত্ত্বের সূত্র নির্ণয়ের চেষ্টা আছে।

চার. রামমোহনই প্রথম ইংরেজি ব্যাকরণের অনুসরণে তাঁর গৌড়ীয় ব্যাকরণে বিভিন্ন বিরতি চিহ্নের ব্যবহার করেছেন। সেগুলি হলকমা, সেমিকোলন, কোটেশন চিহ্ন ইত্যাদি।

পাঁচ. বাংলা সমাসের পথ প্রদর্শক ছিলেন রামমোহন। তিনি এখানে কর্মধারয়, বহুব্রীহি ইত্যাদি সমাসের বিধিবদ্ধ আলোচনা করেছেন।

ছয়. এই ব্যাকরণে পরিভাষা সংক্রান্ত আলোচনায় রামমোহনের গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া গেছে। এখানে অনেক শব্দের পরিভাষা সৃষ্টি করেছেন। সেটি কখনও ইংরেজি শব্দ, কখনও বা বাংলা শব্দের পরিভাষা হয়েছে। যেমন— 'Person' শব্দটির আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন 'পুরুষ'। আবার 'পুরুষ'কে তিনি প্রথম পুরুষ (1st Person), দ্বিতীয় পুরুষ (2nd Person), তৃতীয় পুরুষ (3rd Person)-এ বিভাজন করেছেন। কিন্তু আধুনিক বাংলায় সেটা দাঁড়িয়েছে উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ, প্রথম পুরুষে। এই ভাবে Negative অর্থে 'অভাবার্থ', Tense অর্থে 'ল'কার', Causal verb's অর্থে 'নিজন্ত' ইত্যাদি পরিভাষার কথা বুঝিয়েছেন।

সাত. নবম ও দশম অধ্যায়ের ব্যাকরণ ভাবনা যদি লক্ষ করা যায় তবে দেখা যাবে এই দুটি অধ্যায় রচনায় তিনি ইংরেজি ব্যাকরণকে সম্পূর্ণরূপেই অনুকরণ করেছেন। এক কথায় সেটি ভাষান্তর ছাড়া কিছুই নয়। যেমন, For—জন্যে, Upon—উপরে, Within—ভিতরে ইত্যাদি। এই ভাবে দশম অধ্যায়ের ব্যাকরণ চিন্তাকেও তিনি বাংলা ব্যাকরণে হুবহু অনুবাদ করেছেন।

আট. ক্রিয়ারূপের আলোচনায় রামমোহনের বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। কারণ ইংরেজি ব্যাকরণে ক্রিয়ার সাধুরূপের পাশাপাশি কথ্যরূপও তুলে ধরেছেন। কিন্তু গৌড়ীয় ব্যাকরণে বাংলা ভাষার লেখ্যরূপটাই বেশি গুরুত্ব পেয়েছে।

নয়. গৌড়ীয় ব্যাকরণে তিনি ধ্বনি ও অক্ষরের বিষয়টি বিস্তৃত উদাহরণ নিয়ে বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গিতে বুঝিয়েছেন।

দশ. ইংরেজি ব্যাকরণের সঙ্গে বাংলা ব্যাকরণের সাদৃশ্যগত মিল থাকলেও প্রয়োজনের ভিত্তিতে তার উপস্থাপন করেছেন। ইংরেজি ব্যাকরণ যেহেতু ইংরেজদের বাংলা ভাষায় শিক্ষিত করার জন্যে লেখা হয়েছিল। তাই তার উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ মানুষদের ছিল ভিন্নরকম। আর 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' যেহেতু বাংলা ভাষাভাষী মানুষদের জন্যে লেখা হয়েছিল। তাই তার উপস্থাপন ছিল আর একরকম।

'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' আসলে রামমোহনের বাংলা ভাষাতত্ত্বচর্চার প্রথম ব্যাকরণ গ্রন্থ। তাই এখানে অনেকটাই দোষ-ত্রুটি লক্ষ করা গেছে। তবুও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই ব্যাকরণের সুখ্যাতিই করেছেন। তিনি এই ব্যাকরণের প্রকাশকে ঐতিহাসিক ঘটনা বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী বলেছেন ভিন্ন কথা—

"গৌড়ীয় ভাষা ব্যাকরণে যদিও রচয়িতার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পত্রে পত্রে পাওয়া যায়, তবুও সাধারণ শিক্ষার্থীদের তা বিশেষ কাজে লাগে না। কারণ তা উপক্রমণিকা মাত্র, দ্বিতীয়ত তাঁর ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দসকল এ কালের বাঙ্গালীদের নিকট অপরিচিত।"

প্রমথ চৌধুরীর এই কথাগুলি সত্যি মনে হয় তখনই, যখন এই ব্যাকরণ গ্রন্থের ভবিষ্যৎ লক্ষ করা যায়। কারণ তার ব্যাকরণ ভাবনায় মৌলিকতা থাকলেও পরবর্তীকালে কেউই তার চিন্তা বা পদ্ধতিকে অনুসরণ করেননি।

৩০৩.২.৮.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। বাংলা ভাষাচর্চায় রামমোহন রায়ের অবদান আলোচনা করো।

৩০৩.২.৮.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। ভাষা মনন বাঙালি মণীষা — পবিত্র সরকার, পুনঞ্চ।

২। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ — ডক্টর নির্মল দাশ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

পর্যায় গ্রন্থ - ৩

একক - ৯

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বিন্যাস ক্রম :

৩০৩.৩.৯.১ : ভূমিকা

৩০৩.৩.৯.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০৩.৩.৯.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩০৩.৩.৯.১ : ভূমিকা

বাংলা ভাষাতত্ত্বের ক্রমবিকাশেও বিদ্যাসাগরের নাম জড়িয়ে আছে। আমরা সবাই জানি, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বলা হয় বাংলা ভাষার শিল্পসম্মত গদ্যরীতির উদ্ভাবক। আর সাহিত্যের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে ভাষাতত্ত্বের প্রসঙ্গ। অনুবাদ গ্রন্থের পাশাপাশি বিদ্যাসাগর কিছু মৌলিক গ্রন্থ লিখেছেন। তাতেই ধরা পড়েছে তাঁর গদ্য ভাবনার পরিচিতি। তিনি ব্যাকরণ বিষয়ক যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' (১৮৫১), 'ব্যাকরণ কৌমুদী' (১ম-১৮৫৩, ২য়-১৮৫৩, ৩য়-১৮৫৪, ৪র্থ-১৮৬২), 'বর্ণ পরিচয়' (১ম-১৮৫৫, ২য়-১৮৫৫)। এ ছাড়া কিছু শব্দ সংগ্রহও তিনি করেছিলেন। যেগুলি পরে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' পত্রিকায় ছাপা হয়।

উল্লেখ্য, 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' বিদ্যাসাগরের একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। এই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য বিদ্যাসাগর নিজেই জানিয়েছেন। এই গ্রন্থ পাঠ করার পরেও যে ছাত্রছাত্রীরা উচ্চস্তরের কাব্য, দর্শন, ব্যাকরণশাস্ত্র আয়ত্ত করতে সক্ষম হবে না, এটা বুঝেই তিনি এর কয়েক বছর পর 'ব্যাকরণ কৌমুদী' রচনা করেন। বস্তুত 'উপক্রমণিকা'-রই পূর্ণ ও পরিণত রূপ হল 'ব্যাকরণ কৌমুদী'। 'সংস্কৃত ব্যাকরণে'র উপক্রমণিকা' গ্রন্থে তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের স্বরূপ, রীতি-নীতি, তত্ত্বগতদিক ইত্যাদি বিশ্লেষণ করেছেন। সেই প্রসঙ্গে সংস্কৃত ব্যাকরণের ধ্বনিতত্ত্ব রূপতত্ত্ব সব কিছুই আলোচনা করেছেন।

চার খণ্ডে 'ব্যাকরণ কৌমুদী' রচিত হয়। প্রথম তিনটি খণ্ড 'উপক্রমণিকা'-র মতোই বাংলায় রচিত হয়েছে। শেষ খণ্ডে সংস্কৃত সূত্রের উদাহরণ রয়েছে। 'ব্যাকরণ কৌমুদী'-র প্রথম ভাগটি শিশুদের জন্য। এখানে আছে বর্ণ, সন্ধি, শব্দ, ণত্ব-বিধান ও ষত্ব-বিধান। এরপর সংস্কৃত ব্যাকরণের অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত

ভাবে ধারণা দেবার লক্ষ্যে তিনি দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ দুটি লেখেন। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে শুধুমাত্র কৃৎ প্রকরণ। তৃতীয় ভাগে তিনি লেখেন তিঙন্ত প্রকরণের বিস্তারিত আলোচনা। এ ছাড়া কারক, সমাস, তদ্ধিত প্রত্যয়ের জ্ঞান সংস্কৃত শাস্ত্রের রসাস্বাদনের পক্ষে একান্ত উপযোগী হওয়ার কারণে তিনি কয়েক বছর পর আলাদা করে 'ব্যাকরণ কৌমুদী'-র চতুর্থ খণ্ড রচনা করেন। 'উপক্রমণিকা'-র বিষয়বস্তু থেকে 'ব্যাকরণ কৌমুদী'-তে আলোচিত বিষয় স্বভাবতই কিছুটা কঠিন। তবে সংস্কৃত ব্যাকরণের সহজ আলোচনাই যেহেতু তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল, ফলে কঠিন বিষয়কেও তিনি সরল ভাবেই উপস্থাপন করেছেন।

এই গ্রন্থের প্রথম ভাগের শুরুতেই তিনি বর্ণ সম্পর্কিত ধারণা দিয়েছেন। মহর্ষি পাণিনি যেভাবে বর্ণ নিয়ে আলোচনা করেছেন, তারই সরল রূপ বলা যেতে পারে একে। বিদ্যাসাগর আসলে চেয়েছিলেন, তাঁর এইসব গ্রন্থ পড়েই বাঙালি শিশুরা যেন সংস্কৃত সাহিত্যের ভিত সুদৃঢ় করতে পারে। সংস্কৃত ভাষায় ঢোকার প্রথম পদক্ষেপই হল বর্ণ। বর্ণগুলিকে তিনি দুটি ভাগে ভাগ করেন। স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ। স্বরবর্ণ ১৩টি এবং ব্যঞ্জনবর্ণ মোট ৩৫টি। বর্ণ সংক্রান্ত আলোচনার পরেই তিনি 'সংজ্ঞা' বিষয়ে লেখেন। এটিও সংস্কৃত ব্যাকরণের ধারা মেনেই তিনি লিখেছিলেন। তবে পাণিনি যেভাবে সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করেছেন, বিদ্যাসাগর স্বভাবতই তাঁর চেয়ে অনেক প্রাঞ্জলভাবে তা তুলে ধরেছেন। এরপর তিনি ণত্ব-বিধান ও ষত্ব-বিধান প্রসঙ্গ বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করেছেন। একদম পয়েন্ট করে করে তিনি বিধিগুলিকে তুলে ধরেছেন যাতে ছাত্রছাত্রীদের সুবিধা হয়। এরপরের বিষয় হল সুবন্তপ্রকরণ। পাণিনির ব্যাকরণে তা ঈষৎ জটিলভাবে উল্লিখিত থাকলেও বিদ্যাসাগর নবীন শিক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে তা যথাসম্ভব সহজ ভাষায় তুলে ধরেছেন।

'ব্যাকরণ কৌমুদী' গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে তিনি বিশদে কৃৎ-প্রকরণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রথম ভাগের মতো এই ভাগেও পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' ব্যাকরণ থেকে উপাদান নিলেও শিক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে বাংলাতেই লিখেছেন এবং সহজ পদ্ধতিতে উপস্থাপন করেছেন। কৃৎ-প্রকরণে আলোচ্য প্রত্যয়গুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল কৃৎ প্রত্যয়। পাণিনির অনুসরণে এখানেও সেটাই সবার আগে আলোচিত হয়েছে। তবে পাণিনির প্রত্যয় সংক্রান্ত জটিলতাকে তিনি একেবারেই প্রত্যাহার করেছেন।

বিদ্যাসাগর তাঁর 'ব্যাকরণ কৌমুদী' গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে লিখেছেন তিঙন্ত প্রকরণের সম্পর্কে। ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে তিনি প্রথম তিন ভাগেই কোনও সূত্রের অবতারণা করেননি। অর্থাৎ এই ভাগটিও সরল বাংলাতেই তুলে ধরেছেন। তিঙ্ বিভক্তি ধাতুর পরে বসে। আর যার শেষে এই বিভক্তি বসে, সেটাই তিঙন্তপদ। ধাতু মূলত দুই প্রকার পরস্মৈপদী ও আত্মনেপদী। সংস্কৃত ব্যাকরণে প্রতিটি ধাতু আবার দশটি গণে বিভক্ত। ফলে সৃষ্টি হয়েছে অজস্র সংজ্ঞা, বিধি, কার্য ও সব মিলিয়ে অসংখ্য সূত্র। বিদ্যাসাগর এত জটিলতায় না ঢুকে খুবই সহজভাবে পুরো বিষয়টির আলোচনা করেছেন।

'ব্যাকরণ কৌমুদী'-র চতুর্থ ভাগের আলোচ্য বিষয় হল কারক, সমাস এবং তদ্ধিত প্রত্যয়। এর আগের ভাগগুলিতে কোনও সূত্রের অবতারণা না করলেও এই ভাগে প্রতিটি বিষয় সূত্র সহকারে আলোচিত হয়েছে। তবে এ কথা বলাই বাহুল্য যে পাণিনির তুলনায় বিদ্যাসাগরের সূত্র আলোচনা অনেকটাই সহজ পদ্ধতিতে

হয়েছে। কারকের বিশ্লেষণ করতে গেলে অবধারিতভাবে এসে যায় বিভক্তির আলোচনা। কারক ও বিভক্তি পরস্পর সম্পৃক্ত। বিভক্তি তিন প্রকার। যথা কারক বিভক্তি, বিশেষ অর্থে বিভক্তি এবং উপপদ অর্থে বিভক্তি। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে কারক হল বিভক্তিরই একটি অর্থ বিশেষ। পাণিনি কারক সম্পর্কে আলোচনা করলেও সংজ্ঞা দেননি। শুধুমাত্র লক্ষণগুলি বলেছেন। বিদ্যাসাগর কিন্তু কারকের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা লিখেছেন। পাণিনি কারক ও বিভক্তি উভয় বিষয়েই আলোচনা করলেও বিভক্তিরও কোনও সংজ্ঞা পাই না। বিদ্যাসাগর এ ক্ষেত্রেও সুপরিকল্পিত সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।

বিদ্যাসাগরের এই সংস্কৃতি নির্ভর ভাষাচর্চার নেপথ্যে শুধুই যে তাঁর দুটো ভাষার প্রতি আকর্ষণ ছিল তা নয়। এর পিছনে সমকালীন ভাষাচর্চার ইতিহাসেও একটি প্রণোদনা ছিল। তৎকালীন ভাষাচর্চার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে ওই যুগের একটি সামগ্রিক প্রবণতা প্রতিফলন ঘটেছে বিদ্যাসাগরের এই আগ্রহে। সেই প্রবণতাটি হল বাংলা লেখ্য ভাষার একটি মান্য (standard) রূপের সন্ধান। বলা বাহুল্য, বিদ্যাসাগর এই কাজটি নিপুণভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন।

'বর্ণ পরিচয়' ১ম ভাগে আছে স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণসহ বিভিন্ন বর্ণের কথা। 'ই'-কার, 'আ'-কার, 'অ'-কার, 'এ'-কার ইত্যাদির যোগসহ একাধিক উদাহরণ। সংযুক্ত ব্যঞ্জন, চন্দ্রবিন্দু, বিসর্গ, অনুস্বর ইত্যাদির কথাও তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। আবার দ্বিতীয় ভাগে সংযুক্ত বর্ণের ব্যবহার হাতে কলমে শিখিয়েছেন। এখানে তিনি সংযুক্ত বর্ণ হিসেবে 'য'-ফলা, 'র'-ফলা, 'ল'-ফলা ইত্যাদিকে উদাহরণসহ দেখিয়েছেন। মোট কথা তিনি শিশুদেরকে বাংলা বর্ণের হার্দিক পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে যেভাবে বর্ণ পরিচয়ের অঙ্গ সজ্জা করেছেন তা উল্লেখযোগ্যতার দাবী রাখে।

অনেকে বিদ্যাসাগরকে বিভিন্ন অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন। ভাষাতত্ত্বগত দিক থেকে সেটি হল বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত ভাবাপন্ন করা। কিন্তু এটা সর্বার্থে সঠিক নয়। কারণ খাঁটি বাংলা ভাষার একটি অভিধান প্রস্তুত করার পরিকল্পনা তাঁর তো ছিলই। যদিও সেটা বাস্তবে রূপ পায়নি। তবে অনেক বাংলা শব্দ তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। পরবর্তীকালে সেটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এ ছাড়া বাংলা লিপির সংস্কারের কাজেও বিদ্যাসাগর অনেক শ্রম দিয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগরের বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর ভাষাগত বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। সেগুলি নিম্নরূপ

১. সাধু গদ্যকে তিনি পূর্ণ সমর্থন করে সাহিত্য রচনা করেছিলেন।

২. সাহিত্যে তিনি তৎসম ভাববাচক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে রচনাকে গুরুগম্ভীর করেছিলেন। মূলত তৎসম শব্দ, তদ্ভব ক্রিয়াপদ ও ইডিয়ম ব্যবহার করে বৈচিত্রের পরিচয় দিয়েছেন।

৩. বাংলা বাক্যে স্বাভাবিক পদবিন্যাস রীতি (কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া) গঠন করা তাঁরই অবদান বলে সকলে মনে করেন।

৪. বাংলা সাহিত্যে তিনি সুষম বাক্য গঠনরীতির প্রবর্তন করেছিলেন। এর ফলে পাঠক সহজেই

স্বাভাবিক বিশ্রাম নিয়ে শ্বাসবায়ু যথার্থ রেখে পড়তে পারে। এতে সেই বাক্যের অর্থ-বিকৃত না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

৫. তাঁর রচনায় বিষয় অনুযায়ী বাক্য ও দৈর্ঘ্য সাম্যের পরিচয় পাওয়া যায়। পদ্যের মতো গদ্যেরও যে একটা নির্দিষ্ট ছন্দ আছে, এ কথা প্রথম বুঝেছিলেন বিদ্যাসাগর। তাই প্রথম থেকেই তিনি অর্থ ও ভাব অনুযায়ী যতি চিহ্নের ব্যবহার করেছিলেন।

বিদ্যাসাগরের ভাষা ভাবনা সম্পর্কে বিখ্যাতদের মতামত প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জানিয়েছেন, "বাংলা ভাষাকে পূর্ব প্রচলিত অসাড়ম্বর হইতে মুক্ত করিয়া তাহার পদগুলোর মধ্যে অংশযোজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া, বিদ্যাসাগর যে বাংলা গদ্যকে কেবলমাত্র সর্বপ্রকার ব্যবহারযোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। গদ্যের পদগুলোর মধ্যে একটা ধ্বনি সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া, তাহার গতির মধ্যে একটি অনতি লক্ষ্য ছন্দঃস্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য এবং সবল শব্দগুলো নির্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা ডান করিয়াছেন।"

অন্যদিকে সুকুমার সেন জানিয়েছেন, "বিদ্যাসাগরের রচনাভঙ্গি সর্বত্র তৎসম শব্দবহুল নয়। উপযুক্ত স্থানে সুললিত তৎসম শব্দ এবং তদ্ভব ক্রিয়াপদ ও ইডিয়ম ব্যবহার করিয়া বিদ্যাসাগর বিশেষ শব্দ কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। শেষের দিকের রচনায় এই ভঙ্গি সর্বাধিক প্রকট।"

৩০৩.৩.৯.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। বাংলা ভাষাচর্চায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান আলোচনা করো।

৩০৩.৩.৯.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। হুমায়ুন আজাদ — 'বাঙলা ভাষা' (দ্বিতীয় খণ্ড) (ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪)।

২। ভাষা মনন বাঙালি মণীষা — পবিত্র সরকার, পুনশ্চ।

৩। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ — ডক্টর নির্মল দাশ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

একক-১০
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিন্যাস ক্রম :

৩০৩.৩.১০.১ : ভূমিকা

৩০৩.৩.১০.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০৩.৩.১০.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩০৩.৩.১০.১ : ভূমিকা

"যিনি সোজা কথায় আপনার মনের ভাব সহজে পাঠককে বুঝাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক" 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' প্রবন্ধে বঙ্কিমের এই উক্তিটি থেকে ভাষা সম্পর্কিত একটি দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ যদিও বলেছেন, "সহজ কথায় লিখতে আমায় কহ যে,/সহজ কথা যায় না বলা সহজে।" আসলে লেখকের ভাব ও রূপের উপযুক্ত মেলবন্ধনে একটি লেখা পাঠকের কাছে বোধগম্য হয়ে ওঠে। বঙ্কিম সোজা কথার মধ্যে দিয়ে আসলে লেখকের ব্যক্তিশৈলীকে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর সর্বপেক্ষা বড় অবদান বাংলা গদ্যরীতিকে তিনি গতিশীল করেছেন। বাংলা ভাষচর্চার ক্ষেত্রেও তাঁর বেশ কিছু কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি পৃথকভাবে কোনও ভাষাতত্ত্ব বা ব্যাকরণ বিষয়ক গ্রন্থ রচনা না করলেও তাঁর বেশ কিছু প্রবন্ধের মধ্যেই ভাষাচর্চা সম্পর্কিত বিভিন্ন ভাবনা-চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে। এ সম্পর্কিত তাঁর বেশকয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ হল 'বাঙ্গালা ভাষা', 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন', 'সহজ রচনা শিক্ষা' ও 'উত্তরচরিত' ইত্যাদি। তিনি আসলে ভাষাচর্চাকে নান্দনিকতার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। তাই পৃথকভাবে কোনও ভাষা চর্চার বই লেখার তাগিদ তিনি অনুভব করেননি।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা' (১৮৭৮) প্রবন্ধে আধুনিক বাংলা গদ্যের রূপ কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সে সময় বাংলা ভাষায় রচনার ক্ষেত্রে দুটি পৃথক অভিমত তৈরি হয়েছিল। একদল যাঁরা সংস্কৃত ভাষাকে বাংলা ভাষার জননী মনে করতেন, তাঁদের মতে রচনাতে সংস্কৃত শব্দের বহুল ব্যবহার থাকাটা জরুরী। এই মতে বিশ্বাসী প্রধান মুখপাত্র রামগতি ন্যায়রত্ন। আঞ্চলিক ও বিদেশি শব্দের ব্যবহার তাঁর কাছে বর্জনীয়। অপরপক্ষ সংস্কৃতের বন্ধন থেকে বাংলা ভাষাকে মুক্ত করার কথা ভাবতেন। তারাই বেশি করে সংস্কৃত ব্যতীত আরবি, ফারসি, ও আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করতেন। এই সময় সচেতন মন নিয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বঙ্কিমচন্দ্র তৃতীয় মত ব্যক্ত করছেন এই প্রবন্ধে। তিনি বলেন "সকলের কাছে

যে ভাষা বোধগম্য সে ভাষাতেই বাংলা গদ্য রচিত হওয়া প্রয়োজন।" তিনি আরও বলেন—"যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে, পড়িবা মাত্রই তাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থ গৌরব থাকিলে তাহাই উৎকৃষ্ট"। তাঁর মতে রচনার প্রয়োজনে ইংরেজি, ফরাসি, আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য যে কোনও শব্দ গ্রহণ করা যাবে, কেবলমাত্র অশ্লীল শব্দ বাদে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে ভাষার আলোচনা শব্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। শব্দ নির্বাচনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। যেমন তাঁর কাছে সাধু ভাষাই হল সাহিত্যের ভাষা। তবে তা সংস্কৃত অনুসারী সাধু গদ্য না, আলালী সাধু গদ্যকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। সহজ শব্দের ব্যবহারে তিনি বিশ্বাসী। ভ্রাতার পরিবর্তে ভাই, কর্ণের পরিবর্তে কান, মস্তকের পরিবর্তে মাথা ইত্যাদি।

এই 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে তিনি দুটি রীতির কথা বলেছেনলিখিত ভাষা ও কথিত ভাষা। কথিত ভাষাকে তিনি উপেক্ষা করে লিখিত ভাষাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে দুটি রীতির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। প্রধান পার্থক্য মূলত শব্দ প্রয়োগে। সাধুর রীতিতে তৎসম, তদ্ভব শব্দের প্রাধান্য বেশি।

বঙ্কিমচন্দ্র ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব রূপতত্ত্ব বা বাক্যতত্ত্ব নিয়ে কোনরূপ আলোচনা করেননি। যে রীতি বাংলার জন্য উৎকৃষ্ট মনে হয়েছে তাকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। বলা যায় ভাষাচর্চা বলতে তিনি মৃত শৈলী চর্চাকেই বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে রচনার প্রধান গুণসহজ, সরল ও স্পষ্টতা। কোনও রকম জটিলতা, অতি কাব্যিকতাকে তিনি প্রশ্রয় দেননি। এছাড়াও বিষয় অনুযায়ী ভাষা ব্যবহারের কথাও তিনি বলেন।

'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগেরর প্রতি নিবেদন' (১৮৫৫) প্রবন্ধের মধ্যেও রচনার শৈলী সম্পর্কিত ভাবনার পরিচয় আমরা পাই। তিনি লিখেছেন"সকল অলংকারের শ্রেষ্ঠ অলংকার সরলতা" অর্থাৎ সহজ সরল কথায় বিষয়ভাবনাকে স্পষ্ট করাতেই তিনি বিশ্বাসী। জোড়পূর্বক অলংকারের প্রয়োগ কিংবা অহেতুক বিদ্যাপ্রকাশের চেষ্টা থেকে তিনি বিরত থাকার কথা বলেন। নৈতিকতার প্রসঙ্গেও তিনি বলেন, যা অসত্য, ধর্মবিরুদ্ধ, পরনিন্দা তা পরিত্যাগ করাই শ্রেষ্ঠ।

বঙ্কিমের 'সহজ রচনা শিক্ষা' (১৮৯২) গ্রন্থেও লেখকদের রচনার কতগুলি গুণের কথা তিনি বলেছেন। যেমন—Correctness, Preession এবং Perspecuity। আরও কয়েকটি বিষয়ের কথা তিনি বলেছেন বিশুদ্ধি, অর্থ, ব্যক্তি, প্রঞ্জলতা, অলংকার ও নৈতিকতা।

'উত্তরচরিত' প্রবন্ধেও নৈতিকতার দিকটি তিনি উল্লেখ করেছেন

"কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহেকিন্তু নীতি জ্ঞানের যে উদ্দেশ্য কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য।"

সবশেষে একথা বলতেই হয় বঙ্কিম ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কিত পৃথক কোনও গ্রন্থ রচনা না করলেও ভাষাশৈলী সম্পর্কিত যে সকল ভাবনা তাঁর প্রবন্ধগুলিতে ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর গুরুত্ব কম নয়। ভাষাচিন্তাকে তিনি সাহিত্যিক নান্দনিকতার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন।

৩০৩.৩.১০.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত প্রবন্ধে উল্লেখিত গদ্যশৈলীর পরিচয় দাও।

২) 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধটিকে সামনে রেখে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভাষা-ভাবনার রূপটি নির্মাণ করো।

৩০৩.৩.১০.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১) হুমায়ুন আজাদ : 'বাঙলা ভাষা' (দ্বিতীয় খণ্ড) (ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪)

২) ড. সুখেন বিশ্বাস : 'ভাষাবিজ্ঞান তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ' (প্রথম প্রকাশ মে ২০২১)

একক-১১

শ্যামাচরণ সরকার

বিন্যাস ক্রম :

৩০৩.৩.১১.১ : ভূমিকা

৩০৩.৩.১১.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০৩.৩.১১.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩০৩.৩.১১.১ : ভূমিকা

বাংলা ভাষাতত্ত্ব চর্চার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন শ্যামাচরণ সরকার। প্রথম সিনট্যাক্স সম্বলিত বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থের প্রণেতাও তিনি। তাঁর জন্মের দু'শো বছর অতিক্রান্ত। চৈতন্য দীক্ষাগুরু কেশব ভারতী'র উত্তরপুরুষ শ্যামাচরণ রামতনু লাহিড়ীর কাছে ইংরেজি ভাষার পাঠ গ্রহণ করেন। পরিচিত মহলে অশুদ্ধ উর্দু বলে উপহাসিত হওয়ায় উর্দু ভাষা শিখবেন বলে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। একই সময়ে তিনি ল্যাটিন, গ্রিক ও ইটালিয়ান ভাষাতেও বুৎপত্তি অর্জন করেন। কথিত আছে শ্যামাচরণবাবু একাদশটি ভাষা (পারসী, আরবি, উর্দু, হিন্দি, বাংলা, সংস্কৃত, ইংরাজি, ল্যাটিন, ফরাসি, গ্রিক ও ইতালিয়) জানতেন, তার মধ্যে প্রথম নয়টি ভাষায় তিনি লিখতে সক্ষম ছিলেন। শ্যামাচরণ সরকারের জীবন অধ্যয়ন করলে আমরা দেখি সামান্য বেতনের মুন্সি থেকে কলকাতা মাদ্রাসার বাংলা পণ্ডিত হিসেবে তাঁর পদোন্নতি ঘটে। এরপরে কলকাতা সংস্কৃত কলেজে ইংরাজি ভাষার অধ্যাপক রূপে যোগদান করেন। ছ'বছর পর দেওয়ানি আদালতে পেশকার রূপে নিয়োজিত হন, এই সময় থেকেই অনুবাদক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। বাঙালিদের মধ্যে শ্যামাচরণ'ই প্রথম সুপ্রিম কোর্টের 'Chief Interpreter'-এর পদ অলংকৃত করেন।

কেবলমাত্র উচ্চপদ লাভ এবং বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শী হয়েই যে তিনি লোক সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন তা নয়। স্বদেশী ও বিদেশির প্রয়োজনে বেশ কিছু বই লিখেছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য ব্যাকরণ গ্রন্থটি হল 'Introduction to the Banglee Language' (১৮৫০)। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সিভিলিয়ানদের দেশীয় ভাষা শেখা একপ্রকার বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু বাংলা ভাষা শিক্ষার উপযোগী ব্যাকরণ গ্রন্থ তখন প্রায় নেই বললেই চলে। এই সময়ে শ্যামাচরণ বাবু সিভিলিয়ানদের পারসী, উর্দু, হিন্দী ও বাংলা ভাষা-শিক্ষা দিতেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সম্পাদক মেজর্ মার্সেল সাহেব শ্যামাচরণকে সিভিলিয়ান ছাত্রদের জন্য একটি ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করতে অনুরোধ করেন। তখন তিনি রচনা করলেন 'Induction to the Banglee

Language'। গ্রন্থটি দেশীয় ভাষা-শিক্ষার উপযোগী হওয়ায় কোম্পানি সহস্র মুদ্রার বিনিময়ে বেশ কিছু কপি কিনে নেয়। পরবর্তীতে বেথুন সাহেবের অনুরোধে পূর্বোক্ত গ্রন্থটির কিছু কিছু অংশ পরিমার্জন ও পরিবর্দন করে বাংলা ভাষায় 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' (১৮৫২) নামে গ্রন্থটি পুনরায় প্রকাশিত হয়। এছাড়াও 'ব্যবস্থা দর্পণ', 'ব্যবস্থা চন্দ্রিকা', 'নীতি দর্শন' নামক গ্রন্থগুলি তাঁর শাস্ত্র জ্ঞান, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সুগভীর চিন্তা, স্মৃতি শক্তি, মীমাংসা-সামর্থ্য প্রভৃতির সাক্ষ্য বহন করে।

পণ্ডিত শ্যামাচরণ সরকারের 'Introduction to Banglee Language' এই গ্রন্থটি ব্যাকরণ গ্রন্থগুলির মধ্যে আকারে সবচেয়ে বড়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪০৬। এটিই ছিল তৎকালীন বিদেশিদের জন্য রচিত ব্যাকরণগুলির আদর্শ। কেলগ, বিমস, হর্নল প্রমুখ এই ব্যাকরণটিকে সামনে রেখেই তাঁদের ব্যাকরণটি লিখেছিলেন। গ্রন্থটি দু'টি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশটিতে ব্যাকরণের বিভিন্ন দিকগুলিকে পাঁচটি অধ্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে বাংলা কথ্যরূপের বেশ কিছু নিয়মনীতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রথম অধ্যায়ে, বর্ণের উচ্চারণ, বর্ণের পর্ববিন্যাস ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে বর্ণসমূহের উচ্চারণগত পার্থক্যের বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন। স্বর বর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণ উচ্চারণের ক্ষেত্রে তিনি বেশকিছু নিয়মের কথাও উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে, বাংলা ভাষার রূপতত্ত্বগত দিক বিশ্লেষিত হয়েছে। লিঙ্গ, বচন, কারক, প্রত্যয়, উপসর্গ, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার লিঙ্গরীতি এখানে আলোচিত হয়েছে। কারক ও বচন আলোচনায় নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। গ্রিক ও ল্যাতিন ভাষার সাদৃশ্যকে সামনে রেখে উপসর্গের বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি ক্রিয়াপদ ও পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে সর্বনামের আলোচনা করেছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে, বাক্যনির্মাণের রীতি আলোচিত হয়েছে। বাক্য যে সবসময় তার নির্দিষ্ট ক্রম কর্তা + কর্ম + ক্রিয়া—মেনে চলে না তার সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। পরিবেশ-পরিস্থিতি-ভাব অনুযায়ী বিভিন্ন পদের অবস্থান যে পালটে যায় তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে, ছন্দ নিয়ে তিনি বিস্তর আলোচনা করেছেন। বিভিন্ন রকম ছন্দের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কাব্যভাষা যে গদ্যভাষা থেকে ছন্দের প্রয়োজনে আলাদা হয়ে যায় তা দেখিয়েছেন। বাংলা কাব্যভাষার কয়েকটি বিশেষ দিককে চিহ্নিত করেছেন। কিছু কিছু শব্দকে তিনি কাব্য-পদরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমনযেবা, কেবা, হেন, হিয়া ইত্যাদি। পঞ্চম অধ্যায়ে, অনুকার শব্দ, যৌগিক ক্রিয়াপদ, সন্ধি, সমাস নিয়ে আলোচনা করেছেন। অনুকার শব্দের রূপ বৈচিত্র্য নিয়ে তিনি অভিনব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। তবে সমাস ও সন্ধির আলোচনায় তিনি মৌলিকত্ব দেখাতে পারেননি।

পরিশিষ্ট অংশে ইংরেজি-বাংলা পারিভাষিক শব্দের তালিকা দিয়েছেন। সাধারণ শব্দের পাশাপাশি বেশ কিছু স্বতন্ত্র পারিভাষিক শব্দ তিনি উল্লেখ করেছেন। যেমন

শব্দ	অর্থ
ক. An article	সীমাবাচক বিশেষণ
খ. Perfect tense	অদ্যতন ভূত
গ. Pluperfect	চিরতন ভূত

গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে আলোচিত হয়েছে, কথ্যরূপের বৈশিষ্ট্যসমূহ। কথ্যরূপের কতগুলি রীতির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। যেমন—অ-তৎসম শব্দের সংকোচন, অনুকার শব্দের ব্যবহার, বাংলা কথ্যভাষায় চলিত বাগধারা, প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদির উদাহরণসহ বিশ্লেষণ করেছেন। এছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের কথোপকথন, পত্র লেখার নিয়ম রীতি সম্পর্কে কিছু কথা বলেছেন। বিদেশিদের বাংলা ভাষা শেখানোর উদ্দেশ্যে এ দেশীয় মানুষের সমাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান সম্পর্কেও তিনি অবহিত করেছেন।

উনিশ শতকের আগে যে সব ব্যাকরণ রচিত হয়েছিল তা পূর্ণাঙ্গ রূপ পেল শ্যামাচরণ সরকারের ব্যাকরণটিতে। তিনি খুবই সহজ সরল ভাষায় সংস্কৃতের পাশাপাশি বাংলা ব্যাকরণের দেশজ রূপটিকে তুলে ধরেছেন। বিদেশিদের বাংলা ভাষাচর্চার বিভিন্ন প্রবণতার দিকটিও তিনি তুলে ধরেছেন। বাঙালি সমাজজীবনের সঙ্গেও এই ব্যাকরণের যোগ লক্ষণীয়। বাংলা ব্যাকরণের বেশকিছু সূত্রের আবিষ্কার কর্তা তিনিই। সবশেষে এ কথা বলতেই হয়, বাংলা ভাষাচর্চার ইতিহাসে এই ব্যাকরণটির গুরুত্ব অপরিহার্য। জনশ্রুতি আছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় শ্যামাচরণবাবুর ব্যাকরণ গ্রন্থ না পড়েই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সরিয়ে রেখেছিলেন। যদিও পরবর্তীতে বিদ্যাসাগর ভুল স্বীকার করেছিলেন বলেই জানা যায়। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হয়েছিলেন, খবরটি ভারত সংস্কারক প্রত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের (১৮৭৬) প্রথম সভাপতি ছিলেন। জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে তিনি আরবি ও সংস্কৃত ভাষার 'Comparative Grammer' রচনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন। কিন্তু মৃত্যু তাঁকে এ কাজ সম্পূর্ণ করতে দেয়নি। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই জুলাই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

৩০৩.৩.১১.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১) বহুভাষাবিদ শ্যামাচরণ সরকারের লিখিত ব্যাকরণ গ্রন্থটির পরিচয় দাও।

২) শ্যামাচরণ সরকার লিখিত ব্যাকরণ গ্রন্থটির ধ্বনিগত, রূপগত, ছন্দগত পরিচয় দিয়ে এর অভিনবত্বের দিকটি নিরূপণ করো।

৩০৩.৩.১১.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১) ড. নির্মল দাশ : 'বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ' (১ম প্রকাশ ১৪০৭)

২) ড. সুখেন বিশ্বাস : 'ভাষাবিজ্ঞান তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ' (প্রথম প্রকাশ মে ২০২১)

একক-১২
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিন্যাস ক্রম :

৩০৩.৩.১২.১ : বাংলা ভাষাচর্চায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩০৩.৩.১২.২ : বাংলা উচ্চারণ

৩০৩.৩.১২.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩০৩.৩.১২.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০৩.৩.১২.১ : বাংলা ভাষাচর্চায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিভিন্ন কবিতা, গল্প, উপন্যাসের পাশাপাশি বাংলা ভাষাতত্ত্ব চর্চায় ও রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। অনেক সময় মনে হয় রবীন্দ্রনাথের শুধুমাত্র প্রতিভা কবিতা, গল্প, উপন্যাস রচনা বা লেখকসত্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তা কিন্তু যথার্থ নয়। কারণ তিনি এসবের পাশাপাশি নিরুচ্চার ভঙ্গিতে বাংলা ভাষাতত্ত্বের বিভিন্ন দিকও চর্চা করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে কয়েকটি গ্রন্থ ও রচনা করেছেন। সেগুলি নিম্নরূপ—

১. বাংলা শব্দতত্ত্ব (শেষ সংস্করণ ১৩৯১)

২. শিক্ষা (১৯০৮)

৩. ছন্দ (১৯৩৬)

৪. বাংলা ভাষা পরিচয় (১৯৩৮)

উল্লেখ্য 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' ও 'বাংলা ভাষা পরিচয়' গ্রন্থ দুটি ভাষার বিভিন্ন দিকও বিশ্লেষণ সম্পর্কিত। 'ছন্দ' গ্রন্থটি কাব্য ভাষার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এখানে মৌখিক বা কথ্যভাষা আলোচনার কোনও অবকাশ নেই। আর 'শিক্ষা' গ্রন্থটি মাতৃভাষা ও বিভিন্ন বিদেশি ভাষার আলোচনা বা বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ। অর্থাৎ শেষের গ্রন্থদুটি তে লক্ষণীয় ভাষার সঙ্গে অন্যান্য প্রসঙ্গের যোগসূত্র। যাই হোক রবীন্দ্রনাথের বাংলা ভাষাতত্ত্বের ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, ছন্দতত্ত্ব, শব্দার্থতত্ত্ব সবদিকই আলোচিত হয়েছে।

বাংলা ধ্বনিতত্ত্বে তিনি উচ্চারণ, বৈশিষ্ট্য, উচ্চারণের স্বরূপ, রীতি সবই আলোচনা করছেন। বাংলা শব্দতত্ত্বের কয়েকটি প্রবন্ধ যেমন—

'বাংলা উচ্চারণ', 'স্বরবর্ণ অ', 'বাংলা ভাষার উচ্চারণ' নিয়ে তিনি অনেক কথা বলেছেন। প্রথমে বলেছেন তিনটি স (শ, ষ, স)-এর উচ্চারণ। বাংলায় সব দন্ত 'স' তালব্য 'শ'-এর মতোই উচ্চারিত হয়। কিন্তু এর ব্যতিক্রমও আছে। যেমন—কষ্ট, ব্যস্ত শব্দ দুটি। এখানে প্রথমটির উচ্চারণ তালব্য 'শ' ও দ্বিতীয়টির দন্তন্য 'স'। আবার 'আসতে

হবে' ও 'আশ্চর্য' শব্দে প্রথমটির উচ্চারণ দন্তন্য 'স' ও দ্বিতীয়টির উচ্চারণ তালব্য 'শ' এর মতো। আধুনিক কালে বিভিন্ন ভাষাবিজ্ঞানী যেমন চমস্কি, হালি প্রমুখ ধ্বনির স্বলক্ষণ সম্পর্কে যে-ধরনের কথা বলেছেন সেগুলি তো একদিক থেকে রবীন্দ্রনাথেরই ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে বক্তব্যের গাণিতিক রূপ। বাংলা 'শব্দদ্বৈত' 'ধ্বন্যাত্মকশব্দ', 'ভাষার ইঙ্গিত' ইত্যাদি প্রবন্ধে তিনি ধ্বন্যাত্মক শব্দের বিশ্লেষণ করেছেন।

বিষয়টি এবারে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। কারণ রবীন্দ্রনাথ ধ্বনিতত্ত্বের উপরে একাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন। সেগুলি—'বাংলা উচ্চারণ', 'একটি প্রশ্ন', 'স্বরবর্ণ অ, এ', 'টা টো টে', 'বীমসের বাংলা ব্যাকরণ', 'ধ্বন্যাত্মকশব্দ', 'বাংলা কথ্য ভাষা', 'বাংলা বানান', 'বানানবিধি', ইত্যাদি। এ ছাড়াও 'বাংলা ভাষা পরিচয়'—

এর দুটি পরিচ্ছেদ তো ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ক। যেমন একাদশ ও দ্বাদশ পরিচ্ছেদে আছে ধ্বনিতত্ত্ব ও ছন্দ বিষয়ক দুটি প্রবন্ধ।

৩০৩.৩.১২.২ : বাংলা উচ্চারণ

প্রবন্ধে তিনি বাংলা শব্দ উচ্চারণ করার বিভিন্ন নীতির কথা বলেছেন। উচ্চারণে যে বিশৃঙ্খলা আছে সেটা তিনি খতিয়ে দেখেছেন। এবং কিছু নিয়মাবলীও তিনি লিখেছেন। 'একটি প্রশ্ন' প্রবন্ধটিতে ইংরেজি অক্ষরের বাংলা স্বরান্ত সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন। 'স্বরবর্ণ অ' এবং 'স্বরবর্ণ এ' প্রবন্ধদ্বয় যথাক্রমে 'অ' স্বরের বিকৃতিও 'এ' স্বরের উচ্চারণ প্রসঙ্গে আলোচ্য। এখানে 'এ' কে অনেক সময় 'অ্যা' উচ্চারণ করা হয় সে কথাও বলা হয়েছে। 'টা টো টে' প্রবন্ধে সংস্কৃত প্রত্যয়ের তিনটি ভিন্নরূপ বাংলা ভাষায় বহু দিন থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে, এই সম্পর্কে তিনি কিছু নিয়ম নীতির সন্ধান করেছেন। এগুলি যে স্বরবিকারের নিয়ম তা তিনি বলেছেন। 'বীমসের বাংলা ব্যাকরণ' প্রবন্ধটিতে তিনি অনেক ভুল ধরেছেন। অর্থাৎ বীমস বাংলা ভাষার শব্দাবলীর উচ্চারণ বিধি নিয়ে যেসব কথা বলেছেন সেগুলির কথা তিনি এখানে আলোচনা করেছেন। 'ধ্বন্যাত্মক শব্দ' প্রবন্ধে তিনি তো ওই সব শব্দের প্রকৃতি নির্দেশ করেছেন। 'বাংলা কথ্য ভাষা' প্রবন্ধটি বাংলা ভাষার কথ্য রূপের উপর রচিত। এখানে পুরুষ বচন, বাচ্য, কাল অনুযায়ী কথ্যরূপের সঙ্গে শিষ্টরূপের প্রয়োগগত পার্থক্যের দিক বোঝানো হয়েছে। 'বাংলা বানান' ও 'বানান বিধি' দুটি প্রবন্ধই বানান সম্পর্কিত। 'বাংলা বানান' প্রবন্ধে বাংলা বানানের যে বিভ্রাট দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে সেই সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেছেন। আর 'বানানবিধি' প্রবন্ধে বাংলা বানানের সংস্কার সম্পর্কে বিধিবদ্ধ আলোচনা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তিনি বাংলা ভাষার ধ্বনিগত দোষ—ত্রুটিকে সহজেই অনুধাবন করেছেন। এবং এই অনুযায়ী অনেক সূত্রের মাধ্যমে নয়মাবলীর মাধ্যমে তাঁর ধ্বনিতাত্ত্বিক আলোচনা পরিপুষ্ট হয়েছে।

রূপতত্ত্বের আলোচনায় স্থান পেয়েছে বচন, প্রত্যয়, ধাতু, বিভক্তি, লিঙ্গ, ক্রিয়ার রূপ, শব্দমূল ইত্যাদি। রূপতত্ত্বের আলোচনা মূলত 'বাংলা ভাষা পরিচয়', 'শব্দতত্ত্ব' ইত্যাদি গ্রন্থ ছাড়াও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখা প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বাংলা বিশেষ্য পদে বহুবচনের প্রভাব অল্পই।'

তাঁর মতে ভাষার ব্যাকরণ বিশেষ্য পদও তাঁর রূপান্তরকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। বিশেষণ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য, 'খাঁটি বাংলায় দুই অক্ষরের বেশির ভাগ বিশেষণ শব্দ হলন্ত নহে'। তিনি বিশেষ পদের প্রয়োগ চাতুর্যের কথাও বলেছেন। সর্বনামকে যেমন বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করেছেন, তেমনি লিঙ্গ ও পুরুষের সঙ্গে সর্বনামের সম্পর্ক নির্ণীত হয়েছে তাঁর কলমে। অব্যয়ের আলোচনায় তিনি তো 'ও', 'আর', 'এবং'-এর কথা বলেছেন। বাংলা ক্রিয়াপদের

তালিকা প্রস্তুত করতে গিয়ে এসেছে মৌলিক ক্রিয়াপদ, যৌগিক ক্রিয়াপদ ইত্যাদির কথা। এবং ক্রিয়াপদের মূল হিসেবে তিনি সংস্কৃত ধাতুকেই দায়ী করেছেন। তাঁর মতে কিছু ক্রিয়াপদ নাম ধাতু থেকে; কিছু ধ্বন্যাত্মক ধাতু থেকে সৃষ্ট। এগুলির তিনি উদাহরণ দিয়েছেন।

'শব্দতত্ত্বের একটি তর্ক' প্রবন্ধে তিনি 'গাইব' এর বদলে 'গাব', 'রইবে', এর বদলে 'রবে', 'সবই' এর বদলে 'সবে', 'চাইব' এর বদলে 'চাব' ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছেন। 'ক্রিয়াপদের তালিকা প্রবন্ধে তিনি 'হাওয়া', 'থাকা' ইত্যাদি ক্রিয়াপদের বিশেষ ভঙ্গিগত প্রকৃতি উন্মোচন করেছেন। এর সঙ্গেই অবশ্য এসেছে যৌগিক ক্রিয়াপদের প্রসঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ মূলত বিশেষ্য ও ক্রিয়াযোগে যৌগিক পদ গঠিত হয় এরকম ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

ক. বিশেষ্য + ক্রিয়া = মার খাওয়া

খ. ক্রিয়া + ক্রিয়া = করে ফেলা।

অনুজ্ঞার আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ দুটি প্রকারের কথা বলেছেন। যথা—বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। নঞর্থক ধাতুর বিশ্লেষণে 'না' শব্দের ক্রিয়াপদের রূপ কতটা বৈশিষ্ট্যসম্মত তা প্রকাশিত হয়েছে। যেমন—'তুমি নেই', 'সে নেই', 'আমি নেই' ইত্যাদি। ক্রিয়াবিশেষণের আলোচনায় তিনি দুটি ক্রিয়াপদ এক সঙ্গে জুড়ে তা তৈরির কথা বলেছেন। যেমন—'হেসে খেলে', 'উঠে পড়ে' ইত্যাদি। বাংলা বহুবচনের রূপ তৈরি তে অনেক উদাহরণ দিয়েছেন তিনি। যেমন—গুলা, গুলি, রা,গণ ইত্যাদি-র যোগ তো আছেই, তা ছাড়াও তিনি দেখিয়েছেন ঝাক, গোছা, আঁটি, গ্রাস পত্র ইত্যাদি যোগেও বহুবচন গঠিত হয়। বাংলা শব্দদ্বৈতের আলোচনায় তিনি বলেছেন বিশেষ্য, বিশেষণ বা ক্রিয়াকে দু'বার উচ্চারণ করলে শব্দদ্বৈতের সৃষ্টি হয় যেমন—'গরমগরম' (বিশেষণ), 'দুয়ারে দুয়ারে' (বিশেষ্য) 'খেয়ে খেয়ে' (ক্রিয়া) ইত্যাদি। 'ভাষার ইঙ্গিত' প্রবন্ধে তিনি তো দ্বিরুক্তিয় মূলক ধ্বন্যাত্মক শব্দের বৈশিষ্ট্য, প্রয়োগগতদিক, দার্শনিক তত্ত্বসবই বিশ্লেষণ করেছেন। আবার 'স্ত্রী লিঙ্গ' প্রবন্ধে কীভাবে স্ত্রী লিঙ্গ গঠন করা হয়, স্ত্রীবাচক প্রত্যয় সহযোগিতার ব্যাখ্যা ও উদাহরণ আছে। 'বাংলা ব্যাকরণে তির্যকরূপ' (কারক-বিভক্তি) প্রবন্ধটি বাংলা শব্দের তির্যক রূপের সঙ্গে ক্রিয়া পদের সম্পর্কের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। এটি মূলত শব্দ ও কারক। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ নিজেই 'কারক বিভক্তি' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। সেখানে বিভিন্ন কারকের শ্রেণিবিভাগ ও উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন। বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়ের উদাহরণ সহ প্রত্যয়ের রূপবৈচিত্র্য বিশ্লেষিত হয়েছে। 'বিশেষ বিশেষ্য' ও 'বাংলা নির্দেশক' প্রবন্ধদ্বয়ে বিষয়টি বোঝাতে তিনি মূলত 'সামান্য বিশেষ্য' ও 'Article'-এর কথা বলেছেন।

'উপসর্গ সমালোচনা' প্রবন্ধটি বৈচিত্র্যময়। বিভিন্ন দিক থেকে তিনি উপসর্গের বিশ্লেষণ করেছেন।

ভাষাতত্ত্বের অন্যতম দিক যে ছন্দতত্ত্বগত সেকথার রবীন্দ্রনাথ কখনও ভোলেননি। তিনি বাংলা ছন্দ নিয়ে অনেক গবেষণামূলক কাজ করেছেন। এ বিষয়ে তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'ছন্দ' (১৩৪৩)। এ ছাড়াও 'সাহিত্যেরপথে', 'বাংলা ভাষা পরিচয়' ইত্যাদি গ্রন্থেও ছন্দ সম্পর্কে কমবেশি আলোচনা আছে। তাছাড়া ছন্দ নিয়ে একাধিক প্রবন্ধও লিখেছেন। যেমন—'বাংলা শব্দ ও ছন্দ', 'ছন্দ ও উচ্চারণরীতি', 'গদ্যছন্দ' ইত্যাদি।

পয়ার ছন্দকে তিনি সবচেয়ে পুরনো বলে মেনেছেন। তাঁর মতে ছন্দ যে কোনও ভাষার নিজস্ব ভঙ্গিকে অনুসরণ করে। এই হিসেবে তিনি বৈদিক ভাষার অক্ষরমাত্রিকতার কথা বলেছেন। বাংলা কাব্যে সাধু ও চলিতরূপে ছন্দ ভাবনায় দুই ধরনের ছন্দে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। তা ছাড়া বাংলা ছন্দে হসন্ত সাধনা ছিল তাঁর ভাবনার একটা বড় দিক। তিনি মূল বাংলা ভাষার উচ্চারণের দিকে লক্ষ রেখে ছন্দের বৈচিত্র ঘটাতে চেয়েছিলেন।

৩০৩.৩.১১.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ

২. সুকুমার সেন : ভাষার ইতিবৃত্ত

৩. ড. রামেশ্বর শ : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

৪. পরেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৫. সুখেন বিশ্বাস : প্রসঙ্গ : বাংল ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৬. সুখেন বিশ্বাস : ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ

৭. ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত : 'বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে।

৩০৩.৩.১২.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. বাংলা ভাষাতত্ত্ব চর্চায় রবীন্দ্রনাথের অবদান লিপিবদ্ধ করো।

পর্যায় গ্রন্থ - ৪

একক - ১৩

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিন্যাস ক্রম :

৩০৩.৪.১৩.১ : ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

৩০৩.৪.১৩.২ : সাংস্কৃতিকী

৩০৩.৪.১৩.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩০৩.৪.১৩.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০৩.৪.১৩.১ : ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সুনীতিকুমারের জন্ম ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে অর্থাৎ ১৮৯০-এ। তবে তাঁকে বিংশ শতাব্দীর ভাষাতত্ত্ববিদ হিসেবে ধরা হয়। তিনি মূলত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ভাষার বিশ্লেষণ করেছেন। সবকিছুকে যুক্তি, তথ্য ও প্রমাণ দিয়ে বিচার করেছেন। কলেজ জীবন থেকেই তিনি শুধু বাংলা, ইংরেজি বা সংস্কৃত নয় গ্রিক, লাতিন, ফরাসি, জার্মান, হিন্দি, ওড়িয়া, অসমিয়া, তামিল ইত্যাদি ভাষা ও সাহিত্যের গভীরে ঢোকার চেষ্টা করেন। শুধু ভাষা বা সাহিত্য নয়— ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, চিত্রকলা, স্থাপত্য-ভাস্কর্য, দর্শন, ভূগোল ইত্যাদি বহু বিষয়ে তাঁর আগ্রাহ জন্মায়। তবে ভাষার প্রতিই তাঁর আগ্রহ বেশি ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াকালীনই তিনি মাতৃভাষা নিয়ে গভীর চিন্তা করেন। ফলে ভাষাতত্ত্ব চর্চায় নতুন নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটে।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অনেক ইংরেজি ও বাংলা গ্রন্থ লিখেছেন। ইংরেজি গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য—

১. The Origin and Development of the Bengal Language (1926)

২. A Brief Sketch of Bengali Phonetics (1921)

৩. Bengali SelfTaught (1927)

৪. A Bengali Phonetic Reader (1928)

৫. Indo-Aryan and Hindi (1942)

৬. Languages and Linguistics Problems (1943)

৭. Languages and Literature of Modern India (1945)

৮. Scientific and Technocal Term in Modern Indian Language (1953)

৯. Dravidian (1965)

১০. The people Language and Culture of Orissa (1966)

১১. Phonetics in the study of classical Languages in the East (1967)

১২. Balts andAryan (1967)

১৩. The People Languages and Culture of Orissa (1985).

আবার বাংলা গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

১। বাঙলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা (১৯২১)

২। ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৯৪৫)

৩। সরল ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৯৫৫)

৪। ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা (১৯৪৪)

৫। সাংস্কৃতিকী (১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড)

৬। বাঙলা ভাষা প্রসঙ্গ (১৯৭৫)

The Origin and Development of the Bengali Language : ইংরেজি ভাষায় লেখা প্রথম বাংলা ভাষার ব্যাকরণ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯১৬ সালে চর্যাপদকে 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা নামে প্রকাশ করেন। ফলে চর্যার ভাষা বাংলা কিনা তা প্রামাণ করার কাজ শুরু হয়। O.D.B.L গ্রন্থে সুনীতি বাবু চর্যার ভাষা যে বাংলা তা প্রমাণ করেন।

O.D.B.L গ্রন্থে সুনীতিকুমার ইন্দো — ইউরোপীয় ভাষাগুলিকে কেন্তুম ও সতম ভাষা গুচ্ছে ভাগ করেছেন। কেন্তুমকে তিনি বলেছেন পশ্চিমী গুচ্ছ, আর সতমকে পূর্বী গুচ্ছ। এইগ্রন্থে তিনি বলেছেন—

> "There is again, on proof that primitive Indo Europeans, were a pure and unmixed race."

এর পাশাপাশি তিনি বাংলা ভাষার ইতিহাসও আলোচনা করেছেন। বাঙালি জাতির মূল জাতিগত উপাদান বিশ্লেষণ করে তিনি বলেছেন চারটি জাতির মিশ্রণে বাঙালি জাতি গঠিত।

যেমন—

> "Four tribdes, Pundra, Vanga, Radha and Sumha, were the important ones, who gave their names to the various tracts they inhabited."

A Brief Sketch of Bengali Phonetics : বর্ণনামূলকভাষা বিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এখানে তিনি

আধুনিক বাংলা ভাষার ধ্বনিগুলিকে এককালিক বা বর্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা করেছেন। পাশ্চাত্যে সোস্যুরও ব্রুমফিল্ডের বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বের আলোচনার উপর ভিত্তি করে সুনীতিবাবুর এই গ্রন্থটি রচিত। সংস্কৃত ব্যাকরণের পরিভাষা এই গ্রন্থে অনেক স্থানে দেখা গেছে। ১৯১৮ সালে 'Bengali Phonetics' নামে একটি রচনা 'Modern Review' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পুস্তক আকারে এটি 'A Brief Sketch of Bengali Phonetics' নামে প্রকাশ পায়।

'Bengali Self Taught' ও 'A Bengali Phonetics' : গ্রন্থদুটি ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ক। এখানে বাংলা ধ্বনির উচ্চারণ, বর্ণ ও ধ্বনির সম্পর্ক, ধ্বনির দৈর্ঘ্য, শ্বাসাঘাত ও সুরতরঙ্গ ইত্যাদির আলোচনা আছে।

Bengali Phonetic Reader : এখানে সুনীতিকুমার ড্যানিয়েল জোনসের পদ্ধতিতে ধ্বনিমূল নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। রচনাটির অংশ বিশেষে তিনি ধ্বনিমূল ধারণা প্রয়োগ করে বর্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচনা করেছেন।

Language and Literature of Modern India : নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার বিস্তৃত আলোচনা এখানে আছে। আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের ধারাও এখানে বিশ্লেষিত। শুধু ভারতীয় আর্যভাষা নয়, অন্য আর্যেতর ভাষার বর্ণনাও এ গ্রন্থে পাওয়া যায়। আধুনিক ভারতীয় ভাষা সম্পর্কে একাধিক তথ্য এখানে আছে।

Dravidian : এই গ্রন্থে ভারতীয় আর্যজাতি গোষ্ঠীর সঙ্গে অনার্য দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর ভাষাতত্ত্বগত দিকের তুলনামূলক আলোচনা আছে।

The People Language and Culture of Orissa : এখানে সুনীতিবাবু শুধু ভাষাতত্ত্বের বিশ্লেষণ করেননি। নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, সমাজভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে ওড়িয়া ভাষার ক্রম বিস্তারিত রূপে বর্ণনা দিয়েছেন।

ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ: একটি খাঁটি বাংলা ব্যাকরণ। উচ্চারণ, বর্ণবিন্যাস, ব্যাকরণ বিষয়ে বাংলা ভাষার নিজস্ব রীতির বর্ণনা এখানে আছে। ব্যাকরণ বিশ্লেষণে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। এখানে সুনীতি কুমার সংস্কৃত ব্যাকরণের পরিভাষা ব্যবহার করে বাংলা ভাষার বর্ণনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন। শুধু সংস্কৃত পরিভাষা নয় তাত্ত্বিক আলোচনায় তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের সাহায্য নিয়েছেন। সংস্কৃতের মতোই বাক্যে ক্রিয়াপদের ভিত্তিতে বিভিন্ন কারককে মেনে নিয়েছেন। তবে বাক্যে বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের সঙ্গে ক্রিয়ার বাকি সম্বন্ধ ছাড়া কারকের আর কোনও পরিচয় তিনি দেননি। কারকের বিভক্তিও তিনি সংস্কৃতের রীতিতেই বিচার করেছেন। ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব, শব্দার্থতত্ত্ব, ছন্দ ইত্যাদির বিভিন্ন দিক এখানে বিশ্লেষিত।

ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা ঃ ভারতের আধুনিক আর্যভাষাসমুহের বিবরণ তো আছেই। তা ছাড়া ও দ্রাবিড়, কিরাত, নিষাদ ইত্যাদি গোষ্ঠীর ভাষাসমূহের ঐতিহাসিক বর্ণনার পটভূমিকায় হিন্দি, হিন্দুস্তানি, খড়ি, কেলি, উর্দু ইত্যাদি ভাষার অবস্থান, মান, সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাও এখানে আছে। পাশাপাশি ইংরেজি ভাষার অবস্থান সম্পর্কে ও বিবরণ লক্ষণীয়। বৈদিক ভাষা ও অন্যান্য উপভাষার বিস্তৃত ব্যাখ্যা সুনীতিবাবু দিয়েছেন গ্রন্থটিতে।

৩০৩.৪.১৩.২ : সাংস্কৃতিকী

এই গ্রন্থে সুনীতিকুমার বেদের রচনা কাল নির্ণয় করেছেন। ভাষাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে তিনি বেদের রচনাকালকে খ্রিস্টপূর্বাব্দের আগে বলেছেন। মূলত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেই তিনি বেদতথা 'ঋকসংহিতা'র রচনাকালকে খ্রি: পূ: ১৫০০ অব্দে ফেলেছেন।

ভাষার বিশ্লেষণ শুধু নয় সুনীতি কুমার ভারতীয় জাতি, ধর্ম, শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়েও ভাবনাচিন্তা করেছেন। এ বিষয়ে অনেকগুলি গ্রন্থও লিখেছেন। যেমন—

Kirata-Jana-Kriti: এখানে তিনি ভারতে আগন্তুক বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভাষার বিবর্তনের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন।

The Indo Mongolods : এখানে ভোটচিনীয় ভাষা বা মোঙ্গলয়েড ভাষার উৎস ব্যাখ্যা আছে। ভারতের জাতীয় ঐক্য ও হিন্দু সংস্কৃতি, মণিপুরি ভাষা, সাহিত্য সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনাও তিনি করেছেন।

বৈদেশিকী : দেশ-বিদেশের প্রচলিত ইতিকথা এ গ্রন্থে আছে। বিশ্বমানব সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সাহিত্য বিষয়ক নানা তথ্য এখানে পাওয়া যায়। আয়ারল্যান্ডের আইরিশ জাতির মধ্যে প্রচলিত প্রসিদ্ধ কাহিনি 'দেরদিউ' ও জার্মানজাতির প্রচলিত উপাখ্যান 'ব্রুনহিল্ড' এবং চৈনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির কথা আলোচিত হয়েছে।

এ ছাড়া ভ্রমণ বিষয়ক দুটি রচনাও তিনি লিখেছেন। যথা—'দ্বীপময় ভারত' ও 'রবীন্দ্র সঙ্গমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ'।

বাংলা ভাষার অভিধান সম্পর্কেও সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় আলোচনা করেছেন। দ্বাদশ শতাব্দীর বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দের টীকাসর্বস্বকে তিনি প্রথম বাংলা শব্দসংগ্রহ বলেছেন। আর অভিধান হিসেবে 'চলন্তিকা'র কথা তিনি বলেছেন। এটি চলিত ও সাধুভাষার অভিধান। অভিধানটির পরিশিষ্ট অংশে যে বাংলা ব্যাকরণের রূপটি রাজশেখর বসু দিয়েছেন, তা সুনীতিবাবু প্রশংসা করেছেন।

সুনীতি কুমার সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণ সম্পর্কেও দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। পাণিনির ব্যাকরণকে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। পাণিনির মতো সুনীতিবাবুও স্বীকার করেছেন প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতে অনার্য উপাদান আছে।

৩০৩.৪.১৩.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ

২. সুকুমার সেন : ভাষার ইতিবৃত্ত

৩. ড. বামেশ্বর শ : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

৪. পরেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৫. সুখেন বিশ্বাস : প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৬. সুখেন বিশ্বাস : ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ

৭. ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত : 'বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে।

৩০৩.৪.১৩.৪ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অবদান বুঝিয়ে দাও।

একক-১৪

সুকুমার সেন

বিন্যাস ক্রম :

৩০৩.৪.১৪.১ : সুকুমার সেনের বাংলা ভাষাচর্চা

৩০৩.৪.১৪.২ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩০৩.৪.১৪.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০৩.৪.১৪.১ : সুকুমার সেনের বাংলা ভাষাচর্চা

১৯০১ সালে সুকুমার সেন কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। আচার্য সুনীতি কুমাররের যোগ্য ছাত্র রূপে ১৯২১ সালে সম্মানিক সংস্কৃতে উত্তীর্ণ হন। এবং ১৯২৩ সালে তিনি তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম.এ পরীক্ষায় পাশ করেন প্রথম বিভাগে। ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষাবিদ্যায় তিনি ছাত্রজীবনেই প্রতিভা ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। পাশাপাশি প্রাচীন ভারতীয় আর্য তথা সংস্কৃত ও মধ্যভারতীয় আর্য তথা প্রাকৃত ভাষার অনুশীলন ও গবেষণাতত্ত্বে অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখিয়েছেন। আচার্য সুনীতি কুমারের যোগ্য উত্তরাধিকার তিনি সর্বাথেই বহন করেছেন।

সুকুমার সেন 'Syntax of Old and Middle Indo Aryan Language' বিষয়ে গবেষণামূলক নিবন্ধ রচনা করে 'প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ' বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৩৬ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ. ডি ডিগ্রিতে সম্মানিত হন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল— 'Historical Syntax of Middle and New Indo Aryan'। এ ছাড়া ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক তাঁর প্রধান গ্রন্থগুলি হল—

১. The use of cases in the Vedic Prose (1929)

২. বাংলা সাহিত্যে গদ্য (১৯৩৪)

৩. ভাষার ইতিবৃত্ত (১৯৩৯)

৪. An Outline Syntax of Middle Indo Aryan (1940)

৫. Old Persian Indciption (1941)

৬. A Comparative Grammar of Middle Indo Aryan (1950)

৭. History and Pre-history of Sanskrit (1950)

৮. An Etymological Dictonary of Bengali (1969)

সুকুমার সেনের প্রথম জীবনের রচনা— 'The use of cases in the Vedic Prose' প্রাচীনকালের বৈদিক ভাষার পদগুলিতে কারকের ব্যবহার কেমন ছিল তা নিয়ে এই গ্রন্থটি রচিত। প্রাচীন বৈদিক যুগের বাক্যতত্ত্বও

আলোচনা করেছেন তিনি। তাই এখান থেকেই তাঁর ভাষা জিজ্ঞাসার ব্যাপ্তিপরিলক্ষিত হয়। এছাড়াবৈদিক ভাষার বাক্যগঠন বিষয়েও গবেষণাকরেন।

ভাষা বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড স্যাপিরের মনোলোকে ভাষা ও সাহিত্য ছিল অবিচ্ছন্ন সম্পর্কে যুক্ত। ড. সুকুমার সেন ও সাহিত্যকে দেখেছেন ভাষার সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধে যুক্ত করে। 'বাংলা সাহিত্যে গদ্য' গ্রন্থে তিনি ভাষা বিশ্লেষণের আলোকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে আজ অবধি বিস্তৃত বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশের ধারা আলোচনা করেছেন। আধুনিক শৈলীবিজ্ঞানের ধারাও তাঁর আলোচনায় আছে। এই বিশ্লেষণ যথেষ্ট মননশীল।

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'The Origin and Development of the Bengal Language' গ্রন্থটি ইংরেজি ভাষায় লেখা প্রথম বাংলা ব্যাকরণ। কিন্তু বাংলা ভাষায় লেখা বাংলা ভাষার প্রথম উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ব্যাকরণ গ্রন্থ 'ভাষার ইতিবৃত্ত'। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব, ভারতীয় ভাষাসমূহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং বাংলা ভাষার ঐতিহাসিক ব্যাকরণ সম্পর্কে তীক্ষ্ণস্থ, সংযত, বাহুল্যবর্জিত আলোচনার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থটি অদ্বিতীয়।

প্রাচীন পারসিক ও প্রত্নলিপি শিলা লেখাগুলির আধুনিক সংস্করণ বিশ্লেষণ করে সুকুমার সেন পারসি ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরেছেন 'Old Persian Inscription' গ্রন্থে। এই আলোচনা তাঁকে আন্তর্জাতিক বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে আরও বেশি করে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

'Histor and Pre-history of Sankrit' : গ্রন্থে তিনি মূল ইন্দোইউরোপীয় থেকে প্রাচীন ভারতীয় আর্য তথা বৈদিক বা সংস্কৃত ভাষার জন্মকাহিনি সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। তারই পাশাপাশি অনুমানের উপর ভিত্তি করে সংস্কৃত ভাষার প্রাগৈতিহাসিক রূপের পুনগঠন করেছেন। সংস্কৃত ভাষার ইতিহাস জানতে এই গ্রন্থটি অসাধারণ

A Comparative of Middle Indo Aryan : মধ্যভারতীয় আর্য ভাষার পালিও প্রাকৃতের বিভিন্ন স্তরেররূপ বৈচিত্র্য ও তুলনামূলক ব্যাকরণ আলোচিত হয়েছে তাঁর A Comparative Grammar of Middle Indo Aryan : গ্রন্থে। গ্রন্থটি তাঁকে বিশেষজ্ঞদের সামনের সারিতে অধিষ্ঠিত করেছে।

'An Etymological Dictonary of Bengali' : গ্রন্থটি বাংলায় ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অভিধান। এই গ্রন্থটিতে ব্যুৎপত্তি নির্দেশ, কোন নাম থেকে কোন শব্দের উৎপত্তি হয়েছে ও পরিবর্তিত হতে হতে বর্তমানে তা কী রূপ লাভ করেছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন।

বহু বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করলেও আচার্য সুকুমার সেনের একটি গ্রন্থের নামোল্লেখ করা অবশ্যই প্রয়োজন। সেই গ্রন্থটি হল বহু খণ্ডে বিভক্ত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'। তথ্য ও তত্ত্বে সম্পূর্ণ গ্রন্থটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের গবেষকদের কাছে আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত।

বাংলাদেশের নারী সমাজে ব্যবহৃত উপভাষাগুলির ধ্বনিগত, রূপতত্ত্ব ও ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে আচার্য সুকুমার সেন আলোচনা করেছেন তাঁর 'Women's Dialect of Bengali' গ্রন্থে।

এ ছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তিনি নানা প্রবন্ধ রচনা করেছেন। যেমন—'সেকশুভোদয়া' (১৯২৮), 'চর্যাগীতি পদাবলী' (১৯৫৬), 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' ১৯৬৩), 'চণ্ডীমঙ্গল' (১৯৭৫), 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' ইত্যাদি। এই প্রবন্ধগুলি ভাষা চর্চার দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সুকুমার সেন সম্পর্কে বলা যায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর সমান আগ্রহ ছিল। তাঁর গভীরতা ও অবদানে বাংলা সাহিত্য আজ সমৃদ্ধ। তিনি কেরি থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, আধুনিক মানুষ, এমনকি উপজাতিদের ভাষাতত্ত্ব

বিচার করেছেন বিভিন্ন রচনায়। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিয়ে অভিধান রচনা করেছেন। একদিকে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বংশের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে এদেশীয় ভাষার ঐতিহাসিক অধ্যয়ন, অন্যদিকে সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ চর্চায় তিনি অদ্বিতীয়। উল্লেখ্য বঙ্গ দেশে ভাষা বিজ্ঞানচর্চায় এই ধারার সূত্রপাত ভাষাচার্য সুনীতি কুমারের মধ্যে এমন পরিপুষ্ট আচার্য সুকুমার সেনের হাতে।

সবশেষে বলতে হয় সুকুমার সেনের স্বক্ষেত্র ছিল ভাষা ও সাহিত্য। তাই তাঁর ভাষাজিজ্ঞাসা বহুদূর বিস্তৃত হতে পেরেছে। ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে এদেশের ভাষাতত্ত্বে অধ্যাপনা ও সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ রচনায় সূক্ষ্মভাবে পাণ্ডিত্যের সূত্রপাত ঘটান ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু এই ধারার পূর্ণতা দিয়াছেন ড. সুকুমার সেন। ভাষা সম্পর্কে ড. সেনের ছিল অগাধ দখল। তিনি সাহিত্যের উচ্চাঙ্গের ভাষা থেকে শুরু করে বৈষ্ণবীয় সাহিত্য, ইসলামীয় গোষ্ঠীর ভাষা নিয়ে যেমন মাতামাতি করেছেন, তেমনি বর্ধমানের মুচিদের ভাষার দেশেও তাঁর আসা যাওয়া ছিল। ভাষার ক্ষেত্রে বেদ থেকে বটতলা পর্যন্ত তাঁর অবাধ যাতায়াত। তাঁর ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি আক্ষ্ম লোচনায় কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ যেমন আছেন, তেমনি আছেন প্রিয়নাথ মুখুজ্জেরা। তবে সুকুমার সেনের সাহিত্যের ইতিহাস কারও কাছে 'তথ্য ভারাক্রান্ত বা 'পাণ্ডিত্য কণ্টকিত' বা 'সাহিত্যে রসহীন' মনে হয়েছে। কিন্তু তাঁর সাহিত্য রসাস্বদন ক্ষমতার পরিচয় অসংখ্য প্রবন্ধে যেমন পাওয়া গেছে, তেমনি সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থেও। অমলেন্দু বসু সুকুমারের ইংরেজি ও বাংলা ভাষাশৈলীর প্রশংসা করেছেন 'জ্ঞানপথিক সুকুমার সেন' গ্রন্থে। তিনি বলেছেন— 'সুকুমার সেন চমৎকার বাংলা লেখেন, চমৎকার ইংরেজিও লেখেন। পণ্ডিতেরা সব সময়েই ভাষা মাধুরীর অধিকারী হন না। কিন্তু সুকুমার সেনের ইংরেজি যে কতটা সাবলীল বহুধা শক্তিসম্পন্ন সে কথা বুঝতে পারি তাঁর রচিত 'History of Bengali Literature' পড়লে এবং আমার বিশ্বাস যে জওহরলাল নেহরু যে ঐ গ্রন্থ পড়ে প্রভূত আনন্দ পেয়েছিলেন তার অন্যতম একটি কারণ সুন্দরশৈলী সম্পন্ন এক ব্যক্তি সুন্দরশৈলী সম্পন্ন অপর এক ব্যক্তির রচনায় অচিরেই আকৃষ্ট হন। ঐ শৈলীগুণ সুকুমার সেনের প্রতিটি বাংলা রচনায় বিদ্যমান এমনকী ভারত কোষ অন্তর্গত utility stanted উপযোগিতা ব্যঞ্জক গদ্যেও। ভাষার সঙ্গে রচনা শক্তির এমন পণ্ডিত জনমহলে বিরল।"

৩০৩.৪.১৪.২ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. সুকুমার সেন : ভাষার ইতিবৃত্ত

২. ড. বামেশ্বর শ : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

৩. পরেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলা ভাষা পরিক্রমা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৪. সুখেন বিশ্বাস : প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড)

৫. সুখেন বিশ্বাস : ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ

৬. ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত : 'বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে।'

৩০৩.৪.১৪.৩ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. বাংলা ভাষাতত্ত্বচর্চায় সুকুমার সেনের অবদান আলোচনা করো।

একক-১৫
আবদুল হাই

বিন্যাস ক্রম :

৩০৩.৪.১৫.১ : ভূমিকা

৩০৩.৪.১৫.২ : A Phonetic and Phonological Study of Nasals and Nasalization in Bengali (1960)

৩০৩.৪.১৫.৩ : The Sound Structures of English and Bengali (1961)

৩০৩.৪.১৫.৪ : ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব (১৯৬৪)

৩০৩.৪.১৫.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০৩.৪.১৫.১ : ভূমিকা

বাংলা ভাষাতত্ত্বচর্চার ইতিহাসে অন্যতম একজন শ্রেষ্ঠ ধ্বনিবিজ্ঞানী মুহম্মদ আবদুল হাই। তিনি ১৯১৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যু হয় ১৯৬৯ সালে। তিনি গবেষণার মাধ্যমে বাংলা ধ্বনিসমূহকে সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করেছেন। তিনি ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনায় স্বনিম সম্পর্কে পরিপূর্ণ গবেষণা করেন। মুহম্মদ আবদুল হাই ১৯৫০ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের School of oriental and African Studies-এ ভাষাতত্ত্বে অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য যান। সেখানে তিনি ভাষাতত্ত্ব, ধ্বনিতত্ত্ব ছাড়াও ইংরেজি, আরবি, সংস্কৃত, দ্রাবিড় প্রভৃতি ভাষা শিক্ষার সুযোগ লাভ করেন। ১৯৫২ সালে 'A Phonetic and Phonological Study of Nasal and Nasalization in Bengali' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে ডিস্টিংশন সহ এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর এই অভিসন্দর্ভটি ১৯৬০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়।

ধ্বনিবিজ্ঞানই ছিল মুহম্মদ আবদুল হাই-এর গবেষণার প্রধান বিষয়। তিনি বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার ধ্বনি সংক্রান্ত আলোচনা করেন। তাঁর এই ধ্বনি সংক্রান্ত আলোচনা বিভিন্ন গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। ধ্বনিবিজ্ঞান ও ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর তিনটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল—

১. A Phonetic and Phonological Study of Nasals and Nasalization in Bengali (1960)

২. The Sound Structures of English and Bengali (1961)

৩. ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব (১৯৬৪)

তাঁর এই তিনটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল—

৩০৩.৪.১৫.২ : A Phonetic and Phonological Study of Nasals and Nasalization in Bengali (1960)

এই গ্রন্থে আবদুল হাই ব্রিটিশ ভাষাতত্ত্ববিদ জে.আর.ফার্থের ধ্বনি বিশ্লেষণের তত্ত্ব ও পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। এই গ্রন্থে লেখক বাংলা নাসিক্য ধ্বনি অর্থাৎ নাসিক্য বঞ্জনধ্বনি ও আনুনাসিক স্বরধ্বনি এবং নাসিক্যীভবন সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। এই বিশ্লেষণের জন্য তিনি প্রথমে বিভিন্ন ক্রিয়া ও বিশেষ্যরূপের ভিত্তিতে অক্ষর বা সিলেবল সংগঠন নির্দেশ করেছেন। তারপর ক্রিয়া ও বিশেষ্য রূপের বিভিন্ন অক্ষরের ভিত্তিতে চার শ্রেণির ব্যঞ্জন থেকে নাসিক্য ও আনুনাসিক স্বরধ্বনিগুলি সনাক্ত করেছেন। এই গবেষণায় তিনি মার্কিন ফোনেমিক পদ্ধতি অনুসরণ করেননি। তাঁর পরিবর্তে তিনি এই গবেষণায় তিনি অধ্যাপক ফার্থের 'Prosodic' পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। এই পদ্ধতিতে তিনি বাংলা নাসিক্য ধ্বনি ও ধ্বনির নাসিক্যীভবন বিশ্লেষণ করেছেন। বাংলা ভাষার বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদের Prosodic System-এর পৃথক বৈশিষ্ট্য তিনি এখানে তুলে ধরেছেন। এ ছাড়াও ধ্বনিগত ও ব্যাকরণগত ভাষা সংগঠন তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। বাংলা ভাষার নাসিক্য ধ্বনি ও নাসিক্যীভবনের আলোচনা করতে গিয়ে তিনি প্যাল্টোগ্রাম ও কিনোগ্রাম যন্ত্রের সাহায্য নেন। ফলে এই গবেষণা আরও নির্ভরযোগ্য হয়ে ওঠে। শুধু বাংলা ভাষাই নয়, সংস্কৃত ভাষার নাসিক্য ধ্বনি ও নাসিক্যীভবন সম্পর্কেও মৌলিক কিছু প্রশ্ন তিনি তুলে এনেছেন। তিনি প্রথম বাংলা স্বরধ্বনি ব্যবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন। বাংলা স্বরধ্বনির একক সনাক্তকরণ এবং এককের ধ্বনিতাত্ত্বিক মান নির্ণয় করেছেন। এ ছাড়াও এই গ্রন্থে ক্রিয়ামূল সংগঠন ও তাদের বিভক্তির সংযোগস্থলের ধ্বনির সামগ্রিক গুণ বিশ্লেষণও করা হয়েছে।

আবদুল হাই বাংলা ক্রিয়ামূলের ভিত্তিতে স্বর, ব্যঞ্জন ও নাসিক্য ধ্বনির ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পর বিশেষ্যবাচক শব্দে আদি, মধ্য ও অন্ত্য অবস্থানে জটিল নাসিক্য ধ্বনির অবস্থান পর্যালোচনা করেছেন। অর্থাৎ আদি, মধ্য ও অন্ত্য অবস্থানে নাসিক্য ব্যঞ্জন উচ্চারণে মুখ বন্ধ রাখার সময় কিমোগ্রাফের সাহায্যে পরিমাপের চেষ্টা করেছেন। এ ছাড়া তাঁর গবেষণায় পেশিসমূহের আপেক্ষিক দৃঢ়তার পরিমাপ করার চেষ্টা প্রকাশ পেয়েছে। এই গ্রন্থটিতে তিনি ব্রিটিশ ভাষাতত্ত্ববিদ জে.আর.ফার্থের ধ্বনি বিশ্লেষণের তত্ত্ব ও পদ্ধতি

অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করেছেন। তাই গ্রন্থটিকে ফার্থের প্রসডিক তত্ত্ব প্রয়োগের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শনরূপে গ্রহণ করা হয়।

৩০৩.৪.১৫.৩ : The Sound Structures of English and Bengali (1961)

এই গ্রন্থে বাংলা ও ইংরেজি ভাষার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে এই দুটি ভাষার ধ্বনি সংক্রান্ত আলোচনা। এখানে দুই ভাষার স্বকীয়তা, বৈশিষ্ট্য, গঠন ও ভাষাতাত্ত্বিক বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা ও মূল্যায়ন করা হয়েছে। এই গ্রন্থের মাধ্যমে বাংলা ভাষাতত্ত্বচর্চায় প্রয়োগমূলক ধারার সৃষ্টি হয়েছে। তুলনামূলক ও প্রয়োগমূলক ভাষাবিজ্ঞান চর্চার সার্থক মেলবন্ধন ঘটেছে এই গ্রন্থে। বাংলা ভাষার বাক্যে SOV Structure (Subject + Object + Verb) এবং ইংরেজি ভাষার SVO Structure (Subject + Verb + Object), দুই ভাষার বাক্যে অবস্থিত ধ্বনি সংক্রান্ত আলোচনা এখানে করা হয়েছে।

৩০৩.৪.১৫.৪ : ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব (১৯৬৪)

এটি বাংলা ভাষার প্রথম ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের গ্রন্থ। এখানে উদাহরণ সহযোগে বাংলা ধ্বনি সম্পর্কে গভীর আলোচনা করা হয়েছে। এটি ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্বের একটি আকর গ্রন্থ। এখানে আবদুল হাই-এর গবেষণার মূল অবলম্বন ছিল ফরাসি ভাষাতাত্ত্বিক আন্দ্রে মার্টিনের 'Phonology as Functional Phonetics'। এই ধারণা অনুসারে তিনি ধ্বনির অবস্থান ও ব্যবহার দেখিয়েছেন। বাংলায় ধ্বনির উচ্চারণ ও শ্রুতিঘটিত জ্ঞানকে সার্বিকভাবে ধ্বনিবিজ্ঞান বা Phonetics বলা হয়। অপরদিকে ধ্বনির ব্যবহারবিধি বা প্রয়োগকে ধ্বনিতত্ত্ব বা Phonology বলা হয়। আমেরিকান ধ্বনিতাত্ত্বিকরা Phonology নামের পরিবর্তে Phonemics নামটি ব্যবহার করতে বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। তাঁদের মতে, বিভিন্ন পরিবেশে একটি ধ্বনির সম্ভাব্য সব রকম উচ্চারণ, উচ্চারণে পার্থক্য, মূলধ্বনি নির্ণয় এবং তাদের লিখন পদ্ধতি Phonemics-এর মধ্যে পড়ে। আবদুল হাই তাঁর এই গ্রন্থের ভূমিকায় পৃথিবীর সমস্ত ভাষার ধ্বনি নিয়ে সার্বিকভাবে আলোচনাকে Phonetics বা ধ্বনিবিজ্ঞান এবং নির্দিষ্ট একটি ভাষার ধ্বনি নিয়ে আলচনাকে Phonology বা ধ্বনিতত্ত্ব বলে অভিহিত করেছেন। তিনি ছিলেন একজন Phonetician বা ধ্বনিবিজ্ঞানী।

ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব গ্রন্থটি মোট দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এই দশটি অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে বাংলা ভাষার ধ্বনি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে চিত্রসহযোগে বাগ্‌যন্ত্র নিয়ে আলোচনা

করা হয়েছে। Place of Articulation (উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী), Manner of Articulation (উচ্চারণ পদ্ধতি অনুযায়ী) ধ্বনির বর্গীকরণ এখানে করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলা স্বরধ্বনির সংজ্ঞা ও বৈচিত্র আলোচনা করা হয়েছে। উচ্চারণ অনুযায়ী স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ (বর্তুল, প্রসারিত, নিম্ন, উচ্চ, মধ্য, সংবৃত, বিবৃত, কেন্দ্রিয় ইত্যাদি) এখানে করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির প্রকৃতি (ঘোষ, অঘোষ, মহাপ্রাণ, অল্পপ্রাণ, তড়িত, উষ্ম, ঘৃষ্ট) নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা আছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির গঠন, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। একক ব্যঞ্জন ও সংযুক্ত ব্যঞ্জনের মধ্যে উচ্চারণগত পার্থক্য এখানে নির্দেশ করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে বাংলা ধ্বনির অবস্থান কেমন এবং তাদের পরিবর্তনের নিয়মকানুন আখানে বর্ণিত আছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে অক্ষরতত্ত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। সিলেব্‌ল্‌ অনুযায়ী শব্দের বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে মৌখিকভাবে মানুষের কথা বলার পদ্ধতি নিয়ে ,আলোচনা করা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়ে ধ্বনিগুণ নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

নবম অধ্যায়ে ধ্বনিতরঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে অধিধ্বনিগত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে।

দশম অধ্যায়ে বাংলা লিপি ও বানান সমস্যার কারণ ও তার সমাধান নিয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে। বাংলা লিপির পরিবর্তন ও বিবর্তনের চিত্র এখানে বর্ণিত।

মুহম্মদ আবদুল হাই বাংলা ভাষার ধ্বনির গঠন, উচ্চারণ ও ব্যবহারবিধি সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন। এই গ্রন্থটি তাঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি দান করে। গ্রন্থটির বর্ণনাভঙ্গি বিজ্ঞানানুগ, এর ভাষাভঙ্গি ও রচনাকৌশল এখানে নিরস তত্ত্বকথাও রসপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ফলে এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ পাঠকও সহজে আকৃষ্ট হয়। ভাষাতত্ত্বের মৌলিক বিষয় নিয়ে এরূপ উচ্চমানসম্পন্ন গবেষণাগ্রন্থ দুই বাংলার মধ্যে তিনিই প্রথম রচনা করেন। ধ্বনিবিজ্ঞানী হিসেবে গ্রন্থটি তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দেয়। আধুনিক রীতিতে পর্যবেক্ষণ ও অজস্র উদাহরণ প্রয়োগের জন্য তাঁর এই গ্রন্থটি ধ্বনি সংক্রান্ত আলোচনার দিক দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা গ্রন্থ হয়ে উঠেছে।

৩০৩.৪.১৫.৫ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১) ভাষাবিজ্ঞানচর্চায় মুহম্মদ আবদুল হাই-এর অবদান আলোচনা করো।

২) মুহম্মদ আবদুল হাই কে ছিলেন? ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক তাঁর লেখা কয়েকটি গ্রন্থের নাম লেখো। বাংলা ধ্বনিতত্ত্বের আলোচনায় তাঁর অবদান লিপিবদ্ধ করো।

একক-১৬

সাম্প্রতিক বাংলা ভাষাচর্চা

বিন্যাস ক্রম :

৩০৩.৪.১৬.১ : ভূমিকা

৩০৩.৪.১৬.২ : ঐতিহাসিক (Historical) ধারা

৩০৩.৪.১৬.৩ : বর্ণনামূলক (Descriptive) ধারা

৩০৩.৪.১৬.৪ : তুলনামূলক (Comperative) ধারা

৩০৩.৪.১৬.৫ : প্রয়োগমূলক (Applied) ধারা

৩০৩.৪.১৬.৬ : রূপান্তরমূলক সৃজনমূলক (Transformational Generative) ধারা

৩০৩.৪.১৬.৭ : উপভাষা (Dialect) অধ্যয়ন

৩০৩.৪.১৬.৮ : ভাষাতত্ত্বচর্চার সাম্প্রতিক রূপ

৩০৩.৪.১৫.৯ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৩০৩.৪.১৫.১০ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

৩০৩.৪.১৬.১ : ভূমিকা

সাধারণভাবে বলা যায় ভাষা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যে আলোচনা করা হয়, তাকে বলে ভাষার বিজ্ঞান বা Science of Language। প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষে ভাষাতত্ত্বচর্চার ইতিহাস শুরু হয়েছে। তবে প্রাচীন যুগে ভাষাবিজ্ঞানচর্চা হলেও মধ্যযুগে এই ধারার অবক্ষয় দেখা যায়। কিন্তু আধুনিক যুগে ভাষাবিজ্ঞানচর্চা গৌরবময় অধ্যায়ে ফিরে আসে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে ভাষাবিজ্ঞানচর্চা হচ্ছে। বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ তো ভাষাবিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে অনেকটাই এগিয়ে আছে।

সাম্প্রতিক ভাষাচর্চাকে মূলত ছ'টি ধারায় ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে। যথা—

১) ঐতিহাসিক (Historical) ধারা

২) বর্ণনামূলক (Descriptive) ধারা

৩) তুলনামূলক (Comperative) ধারা

৪) প্রয়োগমূলক (Applied) ধারা

৫) রূপান্তরমূলক সৃজনমূলক (Transformational Generative) ধারা

৬) উপভাষা (Dialect) অধ্যয়ন

এবারে পর্যায়ক্রমে বঙ্গদেশের ভাষাবিজ্ঞানচর্চার বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে আলোচনা করা হল—

৩০৩.৪.১৬.২ : ঐতিহাসিক (Historical) ধারা

ভারতবর্ষে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান চর্চা শুরু হয় মূলত ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে। বঙ্গ দেশে এই ধারার প্রবর্তন করেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি 'The Origin and Development of the Bengali Language' (১৯২৬) গ্রন্থে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেন। বাংলা ভাষার উদ্ভব, ক্রমবিকাশ এ গ্রন্থ থেকে জানা যায়। সুনীতিকুমারের ভাষাচর্চার আরও কয়েকটি গ্রন্থ যেমন 'ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা', 'বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা' ইত্যাদিতে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস বর্ণিত। সুনীতিকুমারের আগেও ঐতিহাসিক ব্যাকরণের চর্চা দেখা গেছে আব্রাহাম গ্রিয়ার্সনের 'Language of India' (১৯০৩) গ্রন্থে। এখানে ভারতের ভাষাসমূহের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে, ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে।

সুনীতিকুমারের পর ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে আই. জে. এস তারাপুরওয়ালা কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছেন। তিনি 'Elements of the Science of Language' গ্রন্থে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ভাষার উপাদান নিয়ে আলোচনা করেন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাঁর 'Out line of an Historical Grammar of the Bengali Language' গ্রন্থে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের ধারাটি আলোচনা করেন। তবে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ হল 'বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত'। এই গ্রন্থে ভাষাবিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব, ঐতিহাসিক ব্যাকরণ, ভারতীয় ভাষাগুলির ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা আছে। ইন্দো-ইউরোপিয় ভাষাবংশ থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভব, উপভাষা ইত্যাদির বর্ণনা দিয়েছেন তিনি। তবে সুনীতিকুমারের O.D.BL গ্রন্থটিই হল বাংলা ভাষার প্রথম ঐতিহাসিক ব্যাকরণ গ্রন্থ, যা ইংরেজি ভাষায় লেখা হয়েছিল। কিন্তু বাংলা ভাষায় লেখা ঐতিহাসিক ব্যাকরণের প্রথম গ্রন্থ সুকুমার সেনের 'ভাষার ইতিবৃত্ত' (১৯৩৯)। এখানে বাংলা ভাষার ইতিহাস ছাড়াও ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব দুইই আলোচিত হয়েছে। এ ছাড়া সুকুমার সেনের উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ব্যাকরণ গ্রন্থ 'History and PreéŸéHistory of Sanskrit'. এখানে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি তে তিনি সংস্কৃত ভাষার ঐতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক রূপ পুনর্গঠন করেন। অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মজুমদার 'আধুনিক ভারতীয় ভাষা প্রসঙ্গে' গ্রন্থে সুন্দরভাবে ভারতীয় ভাষাসমূহের ঐতিহাসিক দিক বিশ্লেষণ করেছেন। বলা বাহুল্য সর্বভারতীয় যে ব্যাকরণ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তৈরি করেছিলেন তার থেকেই একে একে বাংলা ভাষার ঐতিহাসিক, তুলনামূলক ব্যাকরণগুলি লেখা হয়ে থাকে।

৩০৩.৪.১৬.৩ : বর্ণনামূলক (Descriptive) ধারা

ঐতিহাসিক ব্যাকরণের ধারা যেমন সুনীতিকুমারের হাত ধরে শুরু হয়েছিল, তেমনি বর্ণনামূলক ব্যাকরণের ধারারও পথিকৃৎ তিনিই। কেননা, সুনীতিকুমার 'A Brief Sketch of Bengali Phonetics', 'ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' ইত্যাদি গ্রন্থে বর্ণনামূলক ব্যাকরণের ধারা নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রথম গ্রন্থটিতে তিনি বাংলা ভাষার ধ্বনিগুলিকে এককালিক বর্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করেছেন, আর 'ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' গ্রন্থে ধবনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব ইত্যাদিও বর্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করেছেন। বাংলা ভাষায় বর্ণনামূলক ব্যাকরণের অন্যতম একজন স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব হলেন অধ্যাপক ড. বিজনবিহারী ভট্টাচার্য। তাঁর বর্ণনামূলক ব্যাকরণ বিষয়ক গ্রন্থটির নাম 'বাগর্থ' (১৯৫০)। এই গ্রন্থে চলিত বাংলা ভাষার বানান রীতি ও মেদিনীপুরের প্রাদেশিক ভাষার উচ্চারণ প্রণালী আলোচিত। অধ্যাপক প্রণবেশ সিংহরায়ের নামও এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি রামরাম বসুর গদ্যকে বর্ণনামূলক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেছেন। 'Ramram Basu A linguistic study' নামক গ্রন্থে।

বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শব্দতত্ত্ব প্রবন্ধাবলী' (১৯০৭) অর্থাৎ এই গ্রন্থে ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্বের আলোচনা বর্ণনামূলক দৃষ্টিতে করা হয়েছিল। এখানে বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণের নানা প্রবন্ধ যোগ করে পরবর্তীতে 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' (১৯৩৮) নামে প্রকাশ করা হয়েছে। তাই সুকুমার সেন রবীন্দ্রনাথকে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রথম বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনা সুনীতিকুমারই বেশি করেছিলেন। শুধু বাংলা ভাষা নয়, বিভিন্ন ভাষাকেই বর্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা করেছেন ভাষাবিজ্ঞানীরা। যেমন সাঁওতালদের ভাষা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ বর্ণনামূলক বিশ্লেষণ পাওয়া যায় 'Linguistic Sketch of a Santali Idiolect' গ্রন্থে। অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রনাথ বসুর 'বাংলা ভাষার আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিকথা' গ্রন্থেও বর্ণনামূলক ব্যাকরণের ধারাটি দেখা গেছে। তিনি তো 'Old Bengali Structure' গ্রন্থে প্রাচীন বাংলা ভাষার গঠন সম্পর্কে বর্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে লিখেছেন। অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মজুমদার 'বাংলা ভাষা পরিক্রমা' (১ম ও ২য় খণ্ড) গ্রন্থে বর্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে বাংলা ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব ইত্যাদির বিশ্লেষণ করেছেন।

মনে রাখতে হবে সুহাস চট্টোপাধ্যায় বর্ণনামলুক পদ্ধতিকে অভিনব ভাবে প্রয়োগ করেন। তিনি ত্রিপুরার ভোটবর্মি বংশের উপজাতিদের ভাষাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করেছেন "ত্রিপুরার কগবরক ভাষার লিখিত রূপে উত্তরণ' গ্রন্থে। এ ছাড়া দীমকের সঙ্গে লেখা 'Introduction to Bengali' গ্রন্থে তিনি বাংলা ভাষার সূচনার বিষয়টিও বর্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করেছেন। বর্ণনামূলক ব্যাকরণের ধারা আলোচনার দিক দিয়ে কয়েকটি গ্রন্থ হল মুহম্মদ আবদুল হাই রচিত 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব', ড. শিশিরকুমার দাসের 'Early Bengali Prose Carey to Vidyasagar' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে তিনি বাংলা গদ্যের সূচনায় উইলিয়াম কেরি থেকে বিদ্যাসাগরের অবদান বিশ্লেষণ করেছেন। আর আবদুল হাই যেভাবে

ধ্বনিতত্ত্বের নিরিখে বাংলা ধ্বনির বিশ্লেষণ করেছে তাতে গ্রন্থটি বিখ্যাত হয়ে আছে। এ ছাড়া বর্ণনামূলক গ্রন্থ হিসাবে পবিত্র সরকারের 'The Bengali Verb', আবুল কালাম মনজুর মোরশেদের 'বাংলা ভাষাতত্ত্ব' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

৩০৩.৪.১৬.৪ : তুলনামূলক (Comperative) ধারা

ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীতে তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান চর্চাও শুরু হয়ে যায়। বিশ শতকের শুরুর দিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে 'Comparative Philology' বিভাগের প্রতিষ্ঠায় তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বচর্চার পথ একেবারে উন্মুক্ত হয়। আর এখান থেকেই সারা ভারতে তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের ধারাটি ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায় ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতায় রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে উইলিয়াম জোনসএই ধারার সূত্রপাত করেন। তিনি সংস্কৃত ভাষাকে গ্রিক, লাতিন, গথিক, ইতালিক ইত্যাদি ভাষার সঙ্গে তুলনা করে তুলনামূলক ধারাটির প্রবর্তন করেন। ড. সত্যস্বরূপ মিশ্র তাঁর 'A Com parative Grammar of Sanskrit—Greek and Hittite' (১৯৬৮) গ্রন্থে প্রথমে সংস্কৃতের সঙ্গে হিত্তিয় ভাষার তুলনামূলক ব্যাকরণ সম্পর্কে আলোচনা করেন। আর সুকুমার সেন তাঁর 'A Comparative Grammar of Middle Indo Aryan' গ্রন্থে মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার তিনটি স্তরের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে দিয়েছেন। এই গ্রন্থে সুকুমার মধ্য ভারতীয় আর্যের তিনটি স্তরের নিদর্শন, ভাষা বৈশিষ্ট্য, কেনই বা তা আলাদা নামে বিভাজিত সেটা বিশ্লেষণ করেছেন। এ ছাড়াও পরেশচন্দ্র মজুমদার 'সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ' গ্রন্থে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের তুলনামুলক আলোচনা করেছেন। এখানে প্রথমদিকে ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের নিরিখে ভাষাগুলিকে বিশ্লেষণ করেছেন, তার পরে এসেছে তুলনামূলক ধারা। তিনি এই গ্রন্থে ষোলোটি অধ্যায়ের মাধ্যমে বিষয়গুলিকে বিন্যস্ত করেছেন। উল্লেখ্য এটি যেমন ঐতিহাসিক ব্যাকরণের গ্রন্থ তেমনই তুলনামুলক ব্যাকরণের গ্রন্থ হিসাবেও বিখ্যাত।

৩০৩.৪.১৬.৫ : প্রয়োগমূলক (Applied) ধারা

প্রয়োগমূলক ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে দুটি ভাষার তুলনামূলক আলোচনা করে উভয় ভাষার স্বাতন্ত্র্য উদ্ঘাটন করা হয়। প্রয়োগমূলক ভাষাবিজ্ঞানের ধারায় সর্বাধিক কৃতিত্ব দেখান মুহম্মদ আবদুল হাই। তাঁর 'The Sound Structures of English and Bengali' গ্রন্থে। এখানে ভাষাবিজ্ঞানের প্রয়োগমূলক দিকটি অর্থাৎ ইংরেজি ও বাংলা ভাষার শব্দ গঠনের তুলনা করতে তিনি উভয় ভাষার স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন। এই ধরনের ধ্বনিতাত্ত্বিক তুলনার মধ্যে দিয়ে বঙ্গদেশে প্রয়োগমূলক ভাষাবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল।

রামেশ্বর শ 'A comparative study in the phonological systems of Bengali and German' নামক পি-এইচ. ডি. গবেষণা গ্রন্থে বাংলা ও জার্মান ভাষার ধ্বনিতত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। এবং উভয় ভাষার স্বাতন্ত্র্যের দিকগুলি দেখিয়েছেন।

৩০৩.৪.১৬.৬ : রূপান্তরমূলক সৃজনমূলক (Transformational Generative) ধারা

বঙ্গদেশে নয়, পাশ্চাত্যেই প্রথম রূপান্তরমূলক-সৃজনমূলক ধারাটি দেখা যায়। পাশ্চাত্যের ভাষাবিজ্ঞানী নোয়াম চমস্কি তাঁর সঞ্জননী ব্যাকরণের ধারাটি প্রস্তুত করেন।

বঙ্গদেশে রূপান্তরমূলক - সৃজনমূলক তত্ত্বের আলোকে বাংলা ভাষার বিশ্লেষণ করেন অধ্যাপক পবিত্র সরকার। তাঁর গ্রন্থটির নাম 'সংবর্তনী সঞ্জননী ব্যাকরণ ও বাংলা ভাষা বিচারে তার প্রয়োগ'। এ ছাড়া যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উদয় চক্রবর্তী এই ধারার উপরে লিখেছেন 'বাংলা পদগুচ্ছের সংগঠন, নীলিমা চক্রবর্তী লিখেছেন 'বাংলা ভাষা ও চমস্কির তত্ত্ব' প্রভৃতি গ্রন্থ। এ কথা স্বীকার্য ঐতিহাসিক ও বর্ণনামূলক ধারার মতো রূপান্তরমূলক সৃজনমূলক ভাষাচর্চার ধারা আধুনিক বঙ্গদেশে ততটা জনপ্রিয় হয়নি। এখনও বিষয়টা গবেষণার মধ্যে দিয়েই যাচ্ছে।

৩০৩.৪.১৬.৭ : উপভাষা (Dialect) অধ্যয়ন

প্রয়োগমূলক ভাষাবিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে একটি সমৃদ্ধ ধারা হল উপভাষা চর্চা। উপভাষাচর্চার ক্ষেত্রে উপভাষা জরিপ ও মানচিত্র নির্মাণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা উপভাষাগুলির প্রথম সামগ্রিক আলোচনা করেছেন ভাষাবিজ্ঞানী প্রিয়ার্সন। এ ছাড়া অনিমেষকান্তি পাল পূর্ব বাংলার একটি উপভাষা নিয়ে গবেষণা করেছেন। অধ্যাপক মনিরুজ্জামান 'উপভাষা চর্চার ভূমিকা' গ্রন্থে বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষা নিয়ে যে আলোচনা হয়েছে, তার আলাদা- আলাদা তালিকা প্রস্তুত করেছেন। ড. অসীমকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নদিয়া জেলার উপভাষা নিয়ে গবেষণা করেছেন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত 'পূর্ব-পাকিস্তানের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' গ্রন্থে পূর্ব পাকিস্তানের উপভাষা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। চট্টগ্রামের উপভাষা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন মনিরুজ্জামান তাঁর রচিত 'উপভাষা প্রসঙ্গে' গ্রন্থটিতে। সতীশচন্দ্র ঘোষ 'চাকমাদিগের ভাষাতথ্য' গ্রন্থে চাকমা জাতির উপভাষা নিয়ে আলোচনা করেছেন। ড. ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক 'সামাজিক উপভাষা' গ্রন্থে অপরাধ জগতের ভাষা নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ছন্দা ঘোষাল ঝড়খণ্ডী উপভাষা নিয়ে বর্ণনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে অসাধারণ কাজ করেছেন। তাঁর বইয়ের নাম 'ঝাড়খণ্ডী বাংলার ঝাড়গায়ী রূপ'। আবার অনেক ভাষাবিজ্ঞানী জেলাভিত্তিক গবেষণা করেছেন, কেউ বা শহরের উপভাষার একটা তালিকা ও ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে। এত আলোচনা সত্ত্বেও বলা যায় উপভাষা নিয়ে বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ মানচিত্র আজও তৈরি হয়নি। রেখচিত্রের সাহায্যে পাশ্চাত্যে যেভাবে উপভাষার জরিপ বা মানচিত্র হয়েছে, সেভাবে বাংলা ভাষার উপভাষা নিয়ে মানচিত্র হয়নি।

৩০৩.৪.১৬.৮ : ভাষাতত্ত্বচর্চার সাম্প্রতিক রূপ

পৃথিবীতে ভাষাচর্চার ধারাটা দিন দিন নতুন দিকে মোড় নিচ্ছে। ভাষাকেন্দ্রিক মনস্তত্ব, ভাষার বিশ্বজনীনতা সবই এই পর্বে স্থান পাচ্ছে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গেও এই চর্চা চলছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ড. কৃষ্ণপদ গোস্বামী, ড. রেখা মৈত্র, বর্তমান অধ্যাপক ড. উদয়কুমার চক্রবর্তী ভাষাতত্ত্বের উপর ভালো কাজ করেছেন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য 'বাংলা ভাষা' নামে ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এ ছাড়া সুকুমার-পুত্র সুভদ্রকুমার সেন, পরেশ পুত্র অভিজিৎ মজুমদার ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে এখনও নিরন্তর গবেষণা করে চলেছেন। পিছিয়ে নেই রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. মৃণাল নাথ, পবিত্র সরকার বা ড. নির্মল দাস। তাঁরাও ভাষাতত্ত্ব চর্চায় গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অলিভা দাক্ষী ভাষাতত্ত্বের উপর দু"একটা গ্রন্থ লিখেছেন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আশিস দে, অধ্যাপক অরুণ ঘোষ ও অধ্যাপক অমিতাভ দাস এখনও বাংলা ভাষার ব্যাকরণগত দিক নিয়ে নিরন্তর গবেষণা করছেন। অধ্যাপক অরুণ ঘোষ 'ম্যাকসপ্ল্যানক ইনস্টিটিউট ফর ইভোল্যুনাসারি অ্যানথ্রোপলজি' এ ভিজিটিং সাইনটিস্ট হিসাবে যোগ দিয়েছেন। ওঁর গবেষণার ওড়িশার কোরাপুট ও মালকানগিরি জেলার বিলুপ্তপ্রায় তিনটি ভাষা রেমো, গতা, গুভব। ইতিমধ্যে তিনি তো জার্মানির গোয়েটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার ভিজিটিং প্রোফেসর হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন। আর কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. রামেশ্বর শ তো ছিলেন বাংলা ভাষাতত্ত্ব চর্চার আইকন। এ ছাড়া অধ্যাপক পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্যও ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ লিখেছেন। তরুণদের মধ্যে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. বাণীরঞ্জন দে, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবোধ যশ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মীর রেজাউল করিম, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্র বসু, বিশ্বজিৎ রায়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নারায়ণ হালদার, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটির অমিতাভ বিশ্বাস উল্লেখযোগ্য।

৩০৩.৪.১৬.৯ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১) সাম্প্রতিক কালের ভাষাচর্চায় বিভিন্ন ধারার যে পরিচয় পাওয়া যায় তা বিশদে আলোচনা করো।

২) কয়টি ধারায় বাংলা ভাষার চর্চা করা হয়? সেই সব ধারার উল্লেখ করে সাম্প্রতিক কালের ভাষাচর্চার বিষয়টি বুঝিয়ে দাও।

৩০৩.৪.১৬.১০ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ

২। সুকুমার সেন : ভাষার ইতিবৃত্ত

৩। মুহম্মদ আব্দুল হাই : ধ্বনি-বিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব

৪। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত

৫। রামেশ্বর শ : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

৬। সুখেন বিশ্বাস : প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)

৭। সুখেন বিশ্বাস : ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ